

# কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা

গবেষক

ফাহিমদা নুসরাত

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৬

সেশন-২০১১-২০১২

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

DULIB

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

499237



Dhaka University Library



499237



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারী-২০১৭

DIGITIZED

### অস্বীকারনামা

আমি এই মর্মে অস্বীকার করছি যে, 'কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা' শিরোনামের এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রণীত। আমার জানা মতে, পূর্বে এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি, অথবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এর কোন অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয়নি।

*Fahim Nurul*  
30.01.2017

ফাহিমদা নুসরাত

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৬

সেশন-২০১১-২০১২

এম.ফিল গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

499237

ঢাকা  
বিশ্ববিদ্যালয়  
গ্রন্থাগার

## প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ফাহিমদা নুসরাত, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে 'কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রনয়ণ করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত। আমি সম্পূর্ণ পাদুলিপি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

499237

*Najma Begum*  
৩০.০১.১৭

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক



## সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং-
অঙ্গীকার পত্র	i
প্রত্যয়ন পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv-v
চিত্রের তালিকা (ঢাকা ও কলকাতার)	vi- vii
প্রথম অধ্যায়:	১-৩২
ভূমিকা	১-৬
ঢাকার ইতিহাস	৭
(ক) ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৮
(খ) নামকরণের ইতিহাস	৮-৯
(গ) ঢাকার শহর হিসেবে গড়ে ওঠার ইতিহাস	৯-২১
(ঘ) কোম্পানি আমল শুরুর ইতিহাস	২১-২৩
(ঙ) কোম্পানি আমলে চিত্রকলার বিকাশ	২৩-২৬
(চ) ভারতে ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীদের সমাগম	২৬-২৭
(ছ) কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা	২৭-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়:	৩৩-৪৪
কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত বিদেশী চিত্রকর ও স্থানীয়-অস্থানীয় শিল্পীদের জীবনী ও তাদের অঙ্কিত চিত্রের পরিচিত	৩৩-৪৪
তৃতীয় অধ্যায়:	৪৫-৮৬
ঢাকায় কোম্পানি আমলের চিত্রের বিষয়বস্তু	৪৫-৮৬
চতুর্থ অধ্যায়:	৮৭-৯৯
কোম্পানি আমলে ঢাকা ও কলকাতার চিত্রকলার তুলনামূলক আলোচনা	৮৭-৯৯
পঞ্চম অধ্যায়:	১০০-১০৩
বাংলাদেশ ও বিদেশে কোম্পানি আমলে চিত্রকলার সংরক্ষণের স্থানের বিবরণ	১০০-১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়:	১০৪-১০৯
উপসংহার	১০৪-১০৯
পরিশিষ্ট-১: চিত্রকলা ও স্থাপত্যের পরিভাষা	১১০-১১১
পরিশিষ্ট-২: কোম্পানি আমলে আঁকা ঢাকা বিষয়ক কয়েকটি চিত্র	১১২-১১৪
গ্রন্থপঞ্জি	১১৫-১২০

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা' শিরোনামের গবেষণাকর্মটি আমার দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল। গবেষণাকর্মটি প্রণয়নে আমি অনেকের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিক নির্দেশনায় গবেষণাকর্মটি রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাদের সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে যাকে স্মরণ করতে হয় তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম। তাঁর সদয় নির্দেশাধীনে এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে আমার এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। তিনি তাঁর শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমার অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা, বিভিন্ন অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, কোন অংশের পরিমার্জন, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ, সংযোজন করেছেন এমনকি প্রয়োজনীয় বই-পত্র কোথায় পেতে পারি তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত উপর্যুক্ত অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতদসঙ্গে, গবেষণায় যদি কোন দুর্বলতা থেকে যায় তা সম্পূর্ণরূপে আমার অজ্ঞতাবশত ও অক্ষমতার কারণেই। চিত্রকলা নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। চিত্রকলা বিষয়টি এমনই, এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠই যথেষ্ট নয় বরং চিত্রকলার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো গভীরভাবে আয়ত্ব করার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ। আর এক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নাজমা বেগম, সেই জ্ঞানার্জনের পথকে সুপ্রসারিতকরণে আন্তরিক সহযোগিতা করেন। আমার বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো:মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড.মো:মোশাররফ হোসাইন ভূইয়া, ড.মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, জনাব এ কে এম খাদেমুল হক, মিসেস সুরাইয়া আক্তার, মো:মাহমুদুর রহমান বিভিন্ন সময় কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে গবেষণাকর্মটি শেষ করায় অনুপ্রাণিত করেছেন। এজন্য তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের হবিবুল্লাহ পাঠাগার, এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগার, কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, ও কর্মচারীর দেওয়া আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে

উপকৃত করেছে। এজন্য আমি তাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে আমার বন্ধু-বান্ধবের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা যাদের সহযোগিতায় আমি আমার গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে অগ্রসরমান হয়েছি। সর্বশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীবৃন্দ ও শিক্ষকমন্ডলীদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাদের দোয়া, শুভকামনা ও ভালবাসা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পাথেয়।

ফাহিমদা নুসরাত

এম.ফিল গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ও কলকাতার চিত্রের তালিকা

ঢাকার চিত্রের তালিকা (নির্বাচিত)

১. লালবাগ কেল্লার প্রাচীর
২. ধোলাই খালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর
৩. পাগলার পুল
৪. চক ও হোসেনি দালান
৫. বড় কাটরা
৬. টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ
৭. ঢাকার আধুনিক বাসস্থান
৮. তাঁতি ও মসলিন
৯. লালবাগ দুর্গের তোরণ
১০. ঢাকা জেল পরিদর্শন
১১. বরাহ নিধন
১২. লালবাগ দুর্গের তোরণ
১৩. ঢাকার কাছে ফুলবাড়িয়া (সাজার)
১৪. ঢাকা ওয়াটার ওয়াকর্স
১৫. ঢাকার ভগ্নপ্রায় (নিমতলী প্রাসাদ) তোরণ
১৬. বুড়িগঙ্গা নদী থেকে দেখা ঢাকা
১৭. রমনা কালী মন্দির
- ১৮.১. ঈদের মিছিল
- ১৮.২. ঈদের মিছিল
- ১৯.১. মহররমের মিছিল
- ১৯.২. মহররমের মিছিল
- ২০.১. প্যানোরমা অব ঢাকা,
- ২০.২. প্যানোরমা অব ঢাকা

কলকাতার চিত্রের তালিকা (নির্বাচিত)

১. ক্লাইভ স্ট্রিটের দৃশ্য
২. আলিপুরের ঝুলন পুল
৩. ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কলকাতার দৃশ্য
৪. চড়ক পূজার চিত্র
৫. সেক্রেড হাট চার্চটি
৬. সেকালের বাংলাদেশের একটি খামার বাড়ির
৭. উটের গাড়ি - অ্যাটকিনসন
৮. পাদ্রী সাহেব খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন
৯. বড়বাজারের নানা মুখের মেলা
১০. শিবপুরের বিশপস কলেজ



## প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

ঢাকার ইতিহাস

(ক) ইতিহাস ও ঐতিহ্য

(খ) নামকরণের ইতিহাস

(গ) ঢাকার শহর হিসেবে গড়ে ওঠার ইতিহাস

(ঘ) কোম্পানি আমল শুরুর ইতিহাস

(ঙ) কোম্পানি আমলে চিত্রকলার বিকাশ

(চ) ভারতে ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীদের সমাগম

(ছ) কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা

## প্রথম অধ্যায়

### ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা। বাংলার ইতিহাসে ঢাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবেদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন।<sup>১</sup> পরবর্তীতে বাংলার রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত হলেও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জন্য ঢাকা পুনরায় রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকা পূর্ববাংলার অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতার সময় ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫০-৬০ সালের মধ্যে এই শহর বিভিন্ন সামাজিক জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষিত হয়।<sup>২</sup>

একটি জাতির পরিচয় ফুটে উঠে তার শিল্প ও সংস্কৃতিতে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি। মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঢাকা প্রাচীনকাল থেকেই নানারকম শিল্প-সংস্কৃতির জন্য খ্যাতি পেয়ে আসছে। চিত্রশিল্প এদের মধ্যে অন্যতম, যা ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে।

জনপদ হিসেবে ঢাকার বয়স চার শতকেরও বেশি। কিছু ভগ্নপ্রায় প্রাচীন ইमारত যেগুলোতে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হত সেগুলো এখনো সে প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।<sup>৩</sup> ঔপনিবেশিক তথা কোম্পানি আমলে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী ও দেশীয় চিত্রকরদের তুলিতে এসকল ইमारতের চিত্র আজও কালের সাক্ষী হয়ে ঢাকার হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতির খোঁজ দিয়ে যায়। যা ঔপনিবেশিক আমলের ঢাকার ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত।

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার ভারত আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নৌ-পথে।<sup>৪</sup> এরপর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মানুষেরা প্রধানত বণিক, ধর্মপ্রচারক ও ভাগ্যস্বেষণকারীরা বিশেষ করে শিল্পীরা ভারতবর্ষে আগমন শুরু করে। তাঁদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ আহরণ ও জীবিকার অন্বেষণ। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পরবর্তীতে অন্যরূপ ধারণ করে এবং ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে ভারতে আসা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিগুলো ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং ক্ষমতা দখলের এই প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে

পরাজিত করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে। পরবর্তীতে ১৭৬৪ সালে নবাব মীর কাশিম বঙ্গারের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে কোম্পানির ক্ষমতা সুদৃঢ় হয় এবং ইংরেজদের কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তগত হয়। আর এভাবে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয় এবং কোম্পানি বাংলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। এর মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার মূল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত। এই ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়ী হয়েছিল প্রায় দু'শো বছর।<sup>৫</sup> দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালকে দুটো পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় পর্ব ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত। প্রথম পর্ব ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর দ্বিতীয় পর্ব কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ রাজের অধীনে শাসিত হয়।

ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়। “ইংরেজদের প্রবল ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। অবশ্য এই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ভারতের মধ্যযুগীয় সভ্যতা আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়...”<sup>৬</sup>

ঔপনিবেশিক তথা কোম্পানি আমলে বাংলার মূলকেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সকল ধরনের প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হত। তবে এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকার গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যদিও ঔপনিবেশিক তথা কোম্পানি শাসনের প্রভাবে ঢাকা তথা বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হয়। তথাপি এ অঞ্চলে বিস্তার ঘটে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির। তাই উপর্যুক্ত সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে ঢাকার চিত্রকলায়। যা ‘কোম্পানি চিত্রকলা’র আওতায় পড়ে।

রাজনৈতিক দিক থেকে পলাশীতে ইংরেজদের হাতে সিরাজউদ্দৌল্লাহর পরাজয়ের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে নবাবি শাসন ভেঙ্গে পড়ে। যার প্রভাব পড়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। ফলে ক্রমান্বয়ে মুর্শিদাবাদ শৈলীর চিত্ররীতির পতনের সূচনা হয়। আর ঠিক এসময়ে ইউরোপীয় বা ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতার এক নতুন চিত্রশৈলীর উদ্ভব ঘটে যা ছিল মূলত মুঘল ও পাশ্চাত্য রীতির

সংমিশ্রণে সৃষ্টি হলো এক নতুন শৈলীর যা কোম্পানি শৈলী/কোম্পানি স্কুল/কোম্পানি চিত্রকলা বলে পরিচিত লাভ করে।<sup>১</sup>

কোম্পানি চিত্রকলাকে পরিপূর্ণ করে তুলে দুটি ধারা: একটি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা দেশীয় শিল্পীরা, অন্যটি ভারতে আগত ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় পেশাদার এবং শৌখিন শিল্পীরা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে যে সকল সিভিলিয়ানরা কর্মসূত্রে এদেশে এসেছিলেন। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় শিল্পী স্থাপত্যকলা জরিপ করার জন্য যাতে তারা শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং এদেশে পশ্চিমা শিল্প স্থাপত্য রীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ভারতে আগত ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীরা দেশীয় রাজা-মহারাজা ও কোম্পানির বড় বড় সাহেবের প্রতিকৃতি আঁকার সাথে এদেশের নৈসর্গিক দৃশ্য ও মানুষজনের চিত্র অঙ্কন করেন। এসব শিল্পীর চিত্রকর্ম ভারতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।<sup>২</sup>

উপরে উল্লেখিত ভারতে আসা এ সকল ইংরেজ ও ইউরোপীয় পেশাদার ও শৌখিন শিল্পীদের কাজের ধারা মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে প্রত্যেকেই স্বদেশে খ্যাতিমান ছিলেন, সকলেই প্রতিকৃতি (Portrait) আঁকতেন আর সকলেই ছিলেন তেল-রঙের কাজে সিদ্ধহস্ত। আর দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন জল-রঙের ছবি ও সাদা-কালো স্কেচ আঁকিয়েগণ।

### গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের চিত্রকলার বিবর্তনে 'কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা' গবেষণা কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের চিত্রকলার বিষয়ে বিভিন্ন রচনা ও গ্রন্থ প্রণীত হলেও বিষয়টি নিয়ে সামগ্রিকভাবে আজবধি কোন গবেষণা কর্ম হয়নি। ফলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে কিছু গ্রন্থ যেমন কলকাতা হতে প্রকাশিত প্রদ্যোৎ গুহের 'কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর' এই গ্রন্থে কলকাতায় আগত বিদেশীদের(ইংরেজ ও ইউরোপীয়)শুধু সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শিল্পকর্মের ধারণা পাই। তবে উপর্যুক্ত শিল্পীদের চিত্রকর্মের কোন বিস্তারিত আলোচনা সেখানে করা হয়নি। তার এই বইটিতে ঢাকায় আগত দু'একজন শিল্পীর বর্ণনা পাওয়া যায় যেমন ড'য়লি,চিনারি, রবার্ট হোম প্রমুখ। কিন্তু সেখানে লেখক তাদের শিল্পকর্মের কোন বিস্তারিত আলোচনা করেননি। হায়াৎ মাহমুদ সম্পাদিত 'ঢাকার প্রাচীন নির্দর্শন' গ্রন্থটিতে শিল্পী ড'য়লি ও চিনারি অঙ্কিত ঢাকার প্রাচীন স্থাপনাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা করা হয়েছে তার সিংহ ভাগই হচ্ছে ড'য়লির

পর্যবেক্ষণের অনুবাদ কিন্তু লেখকের নিজস্ব বিস্তারিত কোন আলোচনা নেই। ২০১২ সালে প্রকাশিত শামীম আমিনুর রহমান প্রণীত 'শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭' গ্রন্থে কোম্পানি আমলে শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলো তিনি অ্যালবামে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে চিত্রসমূহের কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে তাঁর অ্যালবামে চিত্রসমূহের উপস্থাপনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষ ও যথার্থ হয়েছে। মুনতাসির মামুন রচিত কয়েকটি গ্রন্থে কোম্পানি আমলে বিদেশি(ব্রিটিশ) ও স্থানীয় শিল্পীদের জীবন ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত সুন্দর বিবরণ রয়েছে কিন্তু তা বিস্তারিত নয়। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আর তাই 'কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা' বিষয়ক গবেষণাকর্মটি প্রয়োজন।

### গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণায় প্রাথমিক বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এছাড়া ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হবে। গবেষণার পরিধির মধ্যে থাকবে কোম্পানি আমলে ঢাকা বিষয়ক চিত্রকর্মসমূহ। ঢাকার স্বল্প পরিসরে ঢাকার অঙ্কিত চিত্রকলা ও কোম্পানি আমলে কলকাতায় অঙ্কিত চিত্রকলার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে একটি উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। তবে সে সঙ্গে গ্রন্থাগারভিত্তিক তথ্য-উপাও, জাদুঘর, সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত গবেষণার সংশ্লিষ্ট চিত্রসমূহকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।

### প্রাথমিক উৎস

গবেষণার ক্ষেত্রে সময়সাময়িককালে রচিত চিত্রকলা বিষয়ে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, চিত্রকরদের মূল চিত্র, অ্যালবাম ও ক্যাটালগ প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

### দ্বিতীয়ক উৎস

পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মুদিত গ্রন্থ, সাময়িক ও পত্র-পত্রিকায় রচিত উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ সমূহ, ঢাকা ও কলকাতার জাদুঘর, বাহিবিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘর ও গ্যালারি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত চিত্র পর্যবেক্ষণ দ্বিতীয়ক তথ্য-উপাওের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য হতে ঢাকায় আসা ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তথ্যসূত্র মতে, ঢাকায় যেসকল চিত্রশিল্পীরা আসেন তাঁরা হলেন চার্লস ড'য়লি,

জর্জ চিনারী, ফ্রানসেস্কা রেনাল্ডি, রবার্ট হোম, আর্থার লয়েড ক্লে, চার্লস পোর্ট, জোসেফ স্কট ফিলিপস, হেনরি ব্রিজিজ মোলসওয়ার্থ, ফ্রেডেরিক আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক, শিল্পী আলম মুসাব্বির ও দু'একজন অনামা শিল্পী প্রমুখ।

কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত এসকল আলোচিত চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রের পর্যালোচনার মাধ্যমে কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলার একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। যা অত্র গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বিস্তর পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

## ঢাকার ইতিহাস

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও একটি মহানগর। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ শহর। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ঢাকা বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম শহর এবং রাজধানী। মুসলিম যুগেও বিশেষত, বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) ঢাকা রাজধানী সোনারগাঁও-এর নিকটবর্তী স্থান হিসেবে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছিল।<sup>১</sup> প্রাচীন নথিপত্রে এমনও তথ্য পাওয়া যায় যে, একাদশ শতকের শেষের দিকে অঞ্চলে এক সুবৃহৎ জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসময় ঢাকা বিশ্বের প্রধান জনবহুল শহরগুলোর অন্যতম বিবেচিত হত।<sup>২</sup> সপ্তদশ শতকের শুরুতে রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ মুঘল আমলে সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ার পর এই নগরী ইতিহাসে স্থান করে নেয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অঞ্চলটি সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা নামেই পরিচিত ছিল এবং ঢাকা ছিল এই পূর্ববাংলার প্রধান শহর। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পূর্ববাংলার দু'টি বিভাগে বিভক্ত হয় যথা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা প্রধান নগরী হিসেবে বিকশিত হতে থাকে।<sup>৩</sup> ঢাকা শহরটি 'মসজিদের শহর' নামেও পরিচিত। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র।<sup>৪</sup>

### (ক) ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ধারণা করা হয় যে সময়ের পরিক্রমায় ঢাকা প্রথমে সমতট, পরে বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানেরা ঢাকা অধিকার করে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান অনুযায়ী ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করা হয় এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর নাম অনুসারে রাজধানীর নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'।<sup>৫</sup> সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতীকে রাজমহলের সুবেদার নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ১৬১০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে সরিয়ে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।<sup>৬</sup> ১৬১০ সালে ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা পেলেও সুবা বাংলার রাজধানী বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৬৫০ সালে সুবেদার শাহ সুজা রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন রাজমহলে। শাহ সুজা'র পতনের পর ১৬৬০ সালে সুবেদার মীর জুমলা আবার রাজধানী ঢাকায়

স্থানান্তর করেন। এরপর বেশ কিছু সময়কাল ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করার পর ১৭১৭ সালে সুবেদার মুর্শিদকুলি খান রাজধানী মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং তার নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। এরপর মুঘল শাসনামলে ঢাকায় নায়েব নাজিমদের শাসন শুরু হয়। ১৮৪৩ সালে ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিম গাজীউদ্দিন হায়দার নিঃসন্তান ছিলেন। আর তাই তাঁর মৃত্যুবরণ পর্যন্তই এই (নায়েব) নিয়াবত ব্যবস্থা চালু ছিল।<sup>৭</sup>

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মুসলিম জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা বিকাশের ফলে এবং ঢাকার নবাব পরিবারের উদ্যোগ গ্রহণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা প্রশাসনিক সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হিসাবে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা আবার কিছুকাল তার হারানো মর্যাদা ফিরে পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হলে তা আবার ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করলে ঢাকা তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে এগিয়ে যায়। অবশেষে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে এবং ঢাকা সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।<sup>৮</sup>

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আধুনিক ঢাকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলো হল: জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় শহীদ মিনার, লালবাগের কেন্দ্রা, মুঘল আমলের কিছু বিখ্যাত মসজিদ, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ।

#### (খ) নামকরণের ইতিহাস

ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মত পার্থক্য রয়েছে। বলা হয় যে, “সেন বংশের রাজা বঙ্গালসেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে গহীন জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার একটি মূর্তি খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বঙ্গাল সেন ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর মূর্তিটি ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বলে রাজা



বঙ্গালসেন মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম 'ঢাকা' হিসেবে গড়ে ওঠে।"<sup>১৯</sup>

আবার কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন; তখন সুবেদার ইসলাম খান অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং শহরে 'ঢাক' বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত হয় এবং তা থেকেই শহরের নাম 'ঢাকা' হয়ে যায়। ঢাকার নামকরণ নিয়ে আরো যে সকল জনশ্রুতিগুলো প্রচলিত আছে সেগুলো হল:

“(ক) এক সময়ে এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফ্রনতোসা) ছিল। (খ) গুপ্ত অবস্থায় থাকা দুর্গা দেবীকে (ঢাকা-ইশ্বরী) এ স্থানে পাওয়া যায়; (গ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল; (ঘ) 'ঢাকা ভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল; (ঙ) রাজতরঙ্গনীতে ঢাকা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।”<sup>২০</sup>

আকবরনামা গ্রন্থে ঢাকা একটি 'খানা' (সামরিক ফাঁড়ি) হিসেবে এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহার একটি পরগণা হিসেবে ঢাকা বাজু উল্লেখিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। তবে প্রশাসনিকভাবে নামটি ব্যবহৃত হলেও সাধারণ মানুষের মুখে 'ঢাকা' নামটি থেকে যায়। এখানে উল্লেখ যে, সকল বিদেশি পর্যটক এবং বিদেশি কোম্পানির কর্মকর্তারাও তাদের বিবরণ এবং চিঠিপত্রে 'ঢাকা' নামটিই ব্যবহার করেছেন।<sup>২১</sup>

ঢাকা নগরীকে বর্তমানে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

### (গ) ঢাকার শহর হিসেবে গড়ে ওঠার ইতিহাস

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঢাকার নিকটবর্তী রাজধানী শহর বিক্রমপুর ছিল বিখ্যাত। উপর্যুক্ত সময়ে এ এলাকায় জনবসতি অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে) আধিপত্য বিস্তারের পর নিকটবর্তী

সোনারগাঁ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাক-মুঘল আমলে (চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী) দুটি মসজিদের উৎকীর্ণ লিপি, ধ্বংসাবশেষ এবং লিখিত দলিলে, বিশেষত বাহরিস্তান-ই-গায়েবী থেকে স্বল্প গুরুত্বের একটি ছোট শহর হিসেবে ঢাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। বুড়িগঙ্গার বাম তীরে (উত্তর) বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে প্রাক-মুঘল ঢাকা (মানচিত্র নং- ১)।<sup>১২</sup>

### মানচিত্র নং-১



মানচিত্র নং- ১, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

প্রাক- মুঘল আমলে আকবরের সময়ে ঢাকা একটি সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয় এবং জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকাকে মুঘল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন করে একে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন এবং নামকরণ করে 'জাহাঙ্গীরনগর'। ইসলাম খান ঢাকায় এসে 'ঢাকা দুর্গ' (বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগার নামে পরিচিত) স্থানে তার আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করেন।<sup>১৩</sup> এই দুর্গ এলাকাকে ঘিরেই ঢাকা শহর মুঘল আমলে পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাছাড়া বুড়িগঙ্গা থেকে মালিটোলা-তাতিবাজারের নিকটে ধোলাই খাল পর্যন্ত একটি খাল খনন করে যা 'পুরানো ঢাকা'র সাথে ইসলাম খানের 'নতুন ঢাকা'র সীমানা নির্ধারণ করত (মানচিত্র নং- ২)

## মানচিত্র নং-২



মানচিত্র নং- ২, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

তৎকালীন সময়ে ঢাকায় ভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্ন এলাকায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। এভাবেই মুঘল আমলে গড়ে ওঠে উর্দু রোড, দেওয়ান বাজার, বকশিবাজার, মুঘল টুলি, হাজারিবাগ, আতিশখানা, পিলখানা, মাহতটুলি ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে পুরানো স্থানগুলো বর্ধিত হয় এবং নতুন নতুন এলাকা গড়ে ওঠে। তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার, বানিয়ানগর, কামারনগর ইত্যাদি জায়গাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইসলাম খানের ঢাকা দুর্গটি ছিল শহরের প্রধান কেন্দ্র। যদিও পূর্ব উল্লেখিত শহরের অন্যান্য এলাকা গড়ে উঠেছিল আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। দুর্গের দক্ষিণ এবং একেবারে নদী পর্যন্ত পশ্চিম অংশ গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক এলাকা

হিসেবে। নগরের উত্তর সীমানা বর্ধিত ছিল মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত প্রধান ফটক পর্যন্ত। বর্তমানে এ তোরণটি আধুনিক সমাধিসৌধ তিন নেতার মাজারের নিকট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গ্রন্থাগার-এর পূর্বে অবস্থিত। জানা যায় যে, ঢাকা দুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মীরজুমলা দুটি রাস্তা তৈরি করেছিলেন। একটি রাস্তা ছিল উত্তরে টঙ্গী-জামালপুর দুর্গ পর্যন্ত এবং অপরটি পূর্বে ফতুল্লা দুর্গ পর্যন্ত। এ রাস্তা দুটি শহরের আয়তন বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল।<sup>১৪</sup>

ঢাকা শহর হিসেবে গড়ে ওঠা এবং এর বিস্তৃতি ও পরিধি সমন্ধে ধারণা লাভ করা যায় তৎকালীন ঢাকায় আসা নানা পর্যটকদের বর্ণনায়। ১৬৪০ সালে ঢাকায় আসেন পর্যটক সেবাস্টিয়ান মানরিক। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, সে সময়ে ঢাকা শহরের পরিধি পশ্চিমে মানেশ্বর থেকে শুরু করে পূর্বে নারিন্দা এবং উত্তরে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। ঢাকার এ অংশেই মূলত মুঘলদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে। ১৬৬৩ সালে ঢাকায় আসেন পর্যটক মানুচি। তাঁর মতে ঢাকা শহরে অনেক মানুষের বসবাস ছিল। উক্ত শহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ি ছিল কুটির ঘর। এরপর ১৬৬৬ সালে আসেন পর্যটক টেভার্নিয়ান। তিনি মন্তব্য করেন যে, তার দেখা ঢাকা ছিল জনবসতিপূর্ণ একটি বড় শহর। যার পরিধি লম্বালম্বিভাবে ছিল প্রায় দুই লিগেরও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ১৬৬৯-৭০ সালে ঢাকায় টমাস বাউরি আগমণ করেন। 'ঢাকার পুরোনো কথা' লেখক মনোয়ার আহমদ টমাস বাউরি উক্তি দিয়ে বলেছেন, ঢাকা শহরটি ছিল সুপ্রশস্ত, চারপাশে এর পরিধি ৪০ মাইলের কম নয়। অথচ নিম্নজলাভূমির উপরই ছিল শহরটির অবস্থান।<sup>১৫</sup>

ঢাকা বিরাট এক বাণিজ্যিক এলাকাতে রূপান্তরিত হয় যখন ঢাকায় একটি অভ্যন্তরীণ বন্দর 'শাহবন্দর' স্থাপিত হয় এবং এখানে প্রাদেশিক, আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইউরোপীয়, আমেনীয়, তুর্কি, পাঠান, মারওয়ারী, হিন্দুসহ, বিদেশি ও ভারতীয় বণিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকায় আসা-যাওয়া শুরু করে। পতুগিজ পাদ্রিরা নির্মাণ করেন গির্জা। আর এসময়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসিরা ঢাকায় ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করে।<sup>১৬</sup> ঢাকা এসময় একটি বৃহৎ শিল্প এলাকা হিসেবে বিকশিত হয়। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে আগমন ঘটে বিভিন্ন কারিগর, শিল্পী ও উৎপাদনকারীদের। এরা ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করে, কাঁচামাল সংগ্রহ করে আর তাদের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে নতুন শিল্পকর্ম তৈরি করে স্থানীয় ও বিদেশি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। এদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য মুঘল শাসকেরা তাদের বসবাসের জন্য নিষ্কর জমি প্রদান করেন। সোনা, রুপা, পিতল, কাঠ এবং

শাঁখার কাজ বিপুল পরিমাণে শুরু হয়। তবে এগুলোর মধ্যে সুতি বস্ত্র শিল্পকর্ম ব্যাপক চাহিদা লাভ করে। এই সুতি বস্ত্র বিশ্বেজুড়ে 'মসলিন' নামে পরিচিত লাভ করে। মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিনের উৎপাদন ব্যাপক উন্নতি ও খ্যাতি অর্জন করে। এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঢাকার এই মসলিন রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।<sup>১৭</sup>

মুঘল আমলে ঢাকায় শহরের সাধারণ মানুষের বাড়ি ছিল কাঁচা অর্থাৎ বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি। তবে শাসনকর্তাদের কার্যস্থল ও অন্যান্য আবাসন পাকা ছিল। ঢাকা শহরে দুইটি চওড়া রাস্তা ছিল যা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে তৈরি করা হয়েছিল। শহরটিতে ছোট বড় নানা স্থাপনা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থাপনার মধ্যে লালবাগ দুর্গ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই সময় শহরটি খ্যাতি লাভ করে 'মসজিদের শহর' হিসেবে কারণ এখানে প্রচুর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল।<sup>১৮</sup> প্রথম মুঘল সুবাদার নির্মিত ইসলাম খাঁর সময় একটি বড় ঈদগাহ নির্মাণ করা হয় যা আজও মুঘল স্থাপত্যের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। মূল শহরটি জনবহুল হলেও মুঘলরা থাকতে ভালবাসত প্রশস্ত বাগান সমৃদ্ধ এলাকায়। এ কারণে মূলত বর্তমানের রমনা এলাকায় শহরটির বিস্তার ঘটে। 'বাগ-এ-বাদশাহি' নামে একটি রাজকীয় বাগান শহরের উত্তর প্রান্তে ঘেঁষে গড়ে ওঠে। শহরের ভেতরে নানা হাট বাজার বসত যার ফলে ঢাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। এ সকল কিছুর ফলশ্রুতিতে ঢাকা মধ্যযুগীয় একটি আধুনিক নগরীর মর্যাদায় উন্নীত হয়।

আঠার শতকে রাজধানী ঢাকার জীবনে নেমে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। নবনিযুক্ত সুবেদার মুর্শিদকুলী খান (১৭১৫-১৭১৬) সালে মূলত ব্যক্তিগত কারণে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। এর ফলে ঢাকা হারায় তার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা এবং সেই সাথে বাধাগ্রস্ত হয় এর উন্নয়ন ও বিস্তার। ফলে ঢাকার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। তবে এটি 'ঢাকা নিয়াবত' নামে বাংলার একটি অংশের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এই প্রশাসনিক কেন্দ্রের নির্বাহী কর্মকর্তার পদবি ছিল 'নায়েবে-নাজিম' বা উপ-শাসক।<sup>১৯</sup> এছাড়া পূর্ব বাংলার মুঘল সেনাবাহিনীর এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ঢাকায় থেকে যায়। তবে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করায় এবং তাদের আরোপিত কোম্পানির বাণিজ্যিক ও উৎপাদন নীতি ঢাকার আর্থিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং ঢাকার পতন শুরু হয়। যদিও প্রাদেশিক বিচার বিভাগ ও আপিল দপ্তর ঢাকাতেই ছিল তথাপি ১৮২৮ সাল নাগাদ নগরটি শুধু

একটি জেলা সদরে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুতিবস্ত্র বাণিজ্যের পতন হলে শহরটির পতন দ্রুতগতিতে শুরু হয় এবং তৎকালীন শাসকবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বহু সংখ্যক লোক নগরী ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে ও পল্লী এলাকায় চলে যায়। টেইলরের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৮শ সালেও ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল দুই লাখ কিন্তু চল্লিশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা এক লাখেরও নিচে নেমে আসে এবং লোকসংখ্যা কমার গতির চেয়ে দরিদ্রতার গতি ছিল দ্রুততর।<sup>১০</sup> ১৮৫৯ সালে প্রস্তুতকৃত একটি মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা দৈর্ঘ্যে সোয়া তিন মাইলের সামান্য বেশি এবং প্রস্থে সোয়া এক মাইলের মতো জায়গা দখল করে আছে (মানচিত্র নং- ৩)।

### মানচিত্র নং-৩



মানচিত্র নং- ৩, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

প্রাথমিক ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ১৮৪০ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠা ঢাকার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে শহরটির সীমানা বৃদ্ধি না পেলেও মুঘল শহরটি পাকা রাস্তা, উন্মুক্ত জায়গা, রাস্তার আলো, পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়। ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ব্রিটিশ শাসকদের নতুন নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা গ্রহণ ঢাকা তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করে এবং ঢাকা আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ঢাকার অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সিপাহীর যুদ্ধে পরাজিত সিপাহীদের পুরানো ঢাকার একটি মাঠে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) ফাঁসি দেওয়া হয় যা পরবর্তীতে জাতীয় প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়। এ সময় ঢাকার অনেক ধনী ও ঢাকার নবাব পরিবার ব্রিটিশদের সহযোগিতা করে এবং ব্যাপক আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করে। ব্রিটিশ আমলে ঢাকার নাগরিক জীবনে বহুবিধ সংস্কার আনা হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ঢাকা পৌরসভা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, সরকারি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পৌরসভার তরফ থেকে যথাক্রমে পানি (১৮৭৪ খ্রি:) এবং বিদ্যুৎ (১৯০১ খ্রি:) প্রভৃতি আধুনিক ব্যবস্থা সরবরাহের ফলে ঢাকার নব-রূপায়ন ঘটে আর এসবের বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করে নবাব পরিবারের খাজা আবদুল গণি এবং খাজা আহসান উল্লাহ। ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজ, ১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৮৫ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের মধ্যে রেল সংযোগে স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ সালে ময়মনসিংহের বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত রেল সংযোগের বিস্তৃতি ঘটে। ১৮৬২ সাল থেকে গোয়ালন্দ এবং নারায়ণগঞ্জের মধ্যে স্টিমার সার্ভিস নিয়মিতভাবে চালু হয়।<sup>২১</sup>

ঢাকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ১৯০৫ সালে, যখন এটিকে নব-প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাংলা এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী নির্বাচন করা হয়। যদিও এই পরিবর্তন স্বল্পস্থায়ী হয় এবং ১৯১১ সালে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তথাপি এই স্বল্পসময়ে ঢাকার নগর হিসেবে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটে। এ সময় বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভিন্ন উচ্চ ও মধ্যপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় প্রাদেশিক প্রশাসনের উচ্চ একটি উপরিকাঠামো তৈরি হয়। এ সময়ে একটি সচিবালয়সহ একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। স্বল্পস্থায়ী হলেও এর প্রভাব পড়ে নগরীর সম্প্রসারণ এবং এখানকার জনগোষ্ঠীর ওপর। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের পরিধি বেড়ে দাঁড়ায়

দক্ষিণে কার্জন হল থেকে উত্তরে মিন্টোরোড পর্যন্ত এবং পূর্বে কার্জন হলের বিপরীতে পুরানো হাইকোর্ট ভবনের একটু পূর্বে স্থাপিত গভর্নমেন্ট হাউস থেকে পশ্চিমে নীলক্ষেত পর্যন্ত। যা রমনা এলাকা নামে পরিচিত লাভ করে (মানচিত্র নং- ৪)।

### মানচিত্র নং-৪



মানচিত্র নং- ৪, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

এই অঞ্চলকেই নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এলাকাটিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রীতির দালান-কোঠা ও পাকা রাস্তার একটি পরিকল্পিত সীমানা গড়ে উঠতে থাকে এ সময়ে নীলক্ষেত এলাকার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান রাস্তাটির নামকরণ করা হয় ফুলার রোড যা করা হয়েছিল নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার এর নাম অনুসারে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকার রূপান্তর ঘটে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার



মধ্যে দিয়ে পূর্ববাংলা নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ার ঢাকার উত্থানে অধিকতর স্থায়ী উন্নয়ন ঘটে। ঢাকা নগরীর আরো প্রসার ঘটে এবং আজিমপুর, ধানমন্ডি, তেজগাঁ, রমনা, শান্তিনগর, ইস্কাটনের দিকে শহর সম্প্রসারিত হতে থাকে।

ঢাকার সঙ্গে দেশীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি বরাবরই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে ঢাকা কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষেত্রে ঢাকার হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠী ব্যাপক ভূমিকা রাখে। “১৯০৬ সালে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ”<sup>২২</sup> রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অংশ হয়ে ওঠে ঢাকা। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী অনেক সংগঠনের কর্মতৎপরতাও এই শহরে চলতে থাকে। পাকিস্তান আমলের সকল শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে ঢাকা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলনে ঢাকা শহর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা একটি আধুনিক নগরীতে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩৫ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়েই ঢাকা নতুন ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পায়। ১৮৪১ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার মুসলিম তরুণদের আরবি ও ফারসি, একই সাথে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৮৭৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল (মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত) এবং ১৮৭৬ সালে ঢাকা সার্ভে বা জরিপ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সালে ছাত্রীদের জন্য ইডেন গার্লস স্কুল স্থাপিত হয় যা ছিল ঢাকার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রায় সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়।<sup>২৩</sup> তবে সবচেয়ে বড় মাইলফলকটি রচিত হয় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পূর্নজাগরণের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তিকরণের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় শিক্ষার অগ্রগতি আরও দ্রুতগতিতে হতে থাকে। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ঢাকার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে।

মানচিত্র নং-৫



মানচিত্র নং- ৫, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

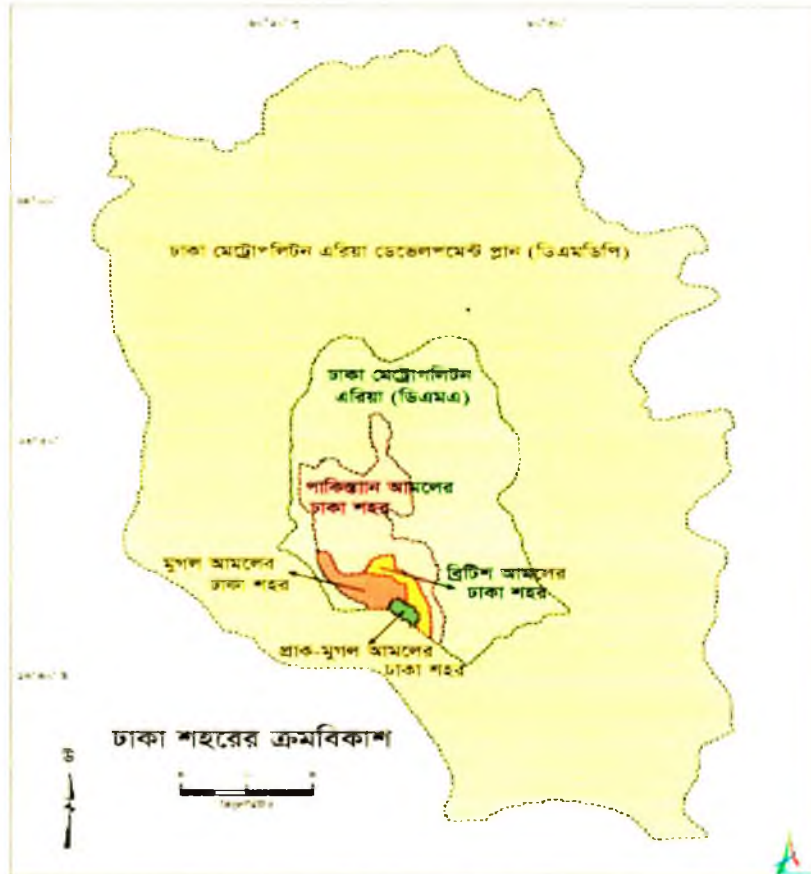
উনিশ শতকে বা এরও পূর্বে ঢাকার বেশিরভাগ মানুষ পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে ও বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। এছাড়া ছিল ঘোড়ার ব্যবহার এবং ধোলাই খাল দিয়ে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা।<sup>২৪</sup> নগরীর দ্রুত প্রসারের সাথে সাথে উনিশ শতকের পরিবহন যথা: পালকি, টাটু ঘোড়া, হাতি ও ভাড়টে ঘোড়ার গাড়ি (Hackney-carriage) প্রভৃতি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর

দেখা যায় না। ফলে রিকশা, বাস, সিএনজি অটোরিকশা, গাড়ি ইত্যাদি নানা প্রকার যান এদের স্থান দখল করে নেন। তবে নগর কর্তৃপক্ষ এখনও একটি বড় রাজধানীর উপযোগী কোনো সুষ্ঠু ও সুপরিষ্কৃত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়নি।

ঢাকার আবাসন ব্যবস্থা উনিশ শতকের শুরু রাস্তা ও লেনের প্রান্তে এক সারিতে স্থাপিত খড়, পাতা ইত্যাদিতে ছাওয়া কুটিরের স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশস্ত রাস্তা ও পরিষ্কৃত এলাকার উপর ইটনির্মিত দালান-কোঠা স্থান করে নিয়েছে।

নগরায়নের ফলে ঢাকায় একটি পৌরসভা গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ১৮৬৪ ঢাকায় প্রথম পৌরসভা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ঢাকা পৌরসভা বাতিল হয় এবং ১৯৬০ সালে সরকার মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৮ সালে ঢাকা পৌরসভা উন্নীত হয় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। “১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে ‘ঢাকা সিটি কর্পোরেশন’ নামকরণ করা হয় ”।<sup>২৫</sup>

মানচিত্র নং-৬



মানচিত্র নং- ৬, সূত্র-বাংলাপিডিয়া-৪

ঢাকার শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে সেগুনবাগিচা, রমনা এবং শাহবাগ এলাকা। এলাকাটিকে 'ঢাকা সাংস্কৃতিক বলয়' নামে একটি পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঢাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল নাটক। অবশ্য এ মাধ্যমের আয়োজক, অভিনেতা এবং দর্শক অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। ঢাকায় এখন নিয়মিতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ক যেমন- শিল্প-কলা, সংগীত, সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্য ও সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাই ঢাকা এশিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় নানা রকমের মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বই মেলা ছাড়াও আরো নানা ধরনের মেলা যেমন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, আইসিটি মেলা, আবাসন মেলা ইত্যাদি এই শহরে আয়োজিত হয়। আরো নানা ধরনের উৎসব ঢাকায় পালিত হয় যেমন বসন্ত উৎসব, বৈশাখীমেলা, পৌষের পিঠা উৎসব ইত্যাদি।

ঢাকার স্থাপত্য নিদর্শনসমূহে প্রাক মুঘল ও মুঘল ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে, যার সাথে ঔপনিবেশিক আমলে যুক্ত হয়েছে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আধুনিকতা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আহসান মঞ্জিল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, হাইকোর্ট বিল্ডিং, রুপলাল হাউস, রোজ গার্ডেন ও কার্জন হল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক নিদর্শন।<sup>২৬</sup> দেশ বিভাগের পর এ নির্মাণশৈলী নতুন আঙ্গিকে অর্থাৎ পশ্চিমা রীতিতে আমরা স্থাপত্যশৈলীতে দেখতে পাই। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র, জাতীয় সংসদ ভবন শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, প্রভৃতি।

ঢাকায় চিত্রকলার চর্চার যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ঢাকার স্থাপনা, জীবন ও প্রকৃতি, আশপাশ, পরিবেশ, আচার-আচরণ, পেশাদারী, সংস্কৃতি নিয়ে কোম্পানি আমল হতে দেশি ও ঢাকায় আগত ইউরোপীয় শিল্পীরা নানা চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন। এসকল চিত্রশিল্পীদের মধ্যে চার্লস ড'য়লি, জর্জ চিনারী, রবার্ট হোম, আর্থার লয়েড ক্রে, জোসেফ স্কট ফিলিপস, হেনরি ব্রিজিজ মোলসওয়ার্থ, ফ্রেডেরিক আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক, দেশী শিল্পী আলম মুসাব্বির এবং অনামা শিল্পীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। “এসকল চিত্রকরদের তুলিতে ফুটে ওঠেছে আঠারো ও উনিশ শতকের ঢাকা ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থাপত্য, দুর্গ, পুল, তোরণ, অধিবাসী, পরিবেশ-প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রভৃতির এক নিখুঁত চিত্র”।<sup>২৭</sup> তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আলোকচিত্রের গ্রাহক যন্ত্রের (ক্যামেরা) আমদানির ফলে কোম্পানিরীতির চিত্রকর্মের

বাজার ধস পড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন দেশীয় নারী শিল্পী মেহেরবানু খানমের কথা জানা যায় তিনি ছিলেন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর কন্যা তবে তিনি ঢাকা বিষয়ক কোনো চিত্র এঁকেছিলেন কি না তা জানা যায়নি। ঢাকার চিত্রকলার এই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাতে ঢাকায় গড়ে ওঠে চারুকলা ইনস্টিটিউট। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক চারুকলা ইনস্টিটিউট।<sup>২৮</sup>

### (ঘ) কোম্পানি আমল চরুর ইতিহাস

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো দা গামার ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে অবতরণ ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করে।<sup>২৯</sup> ভারতের মসলা এবং সুগন্ধী দ্রব্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান বানিজ্যপণ্য ছিল যা তারা আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহে প্রেরণ করত। উল্লেখ যে, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে অটোমানদের কন্সট্যান্টিনোপল অধিকারের কারণেই ইউরোপীয় বণিকগণ তাদের চিরাচরিত বাণিজ্য পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। দুঃসাহসিক নাবিক ভাস্কো দা গামা কর্তৃক নতুন নৌপথ আবিষ্কার ও পশ্চিম ভারতে অবতরণের ফলে পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের লাভজনক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। এর ফলে পর্তুগিজদের সাথে ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসিরা প্রাচ্যের লাভজনক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপর্যুক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগ্রা এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অপরদিকে তারা পর্তুগিজ ও অপরায়িত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পেশীবলে ও কূটনৈতিক চতুরতায় পর্যদুস্ত করে ভারত, সুমাত্রা ও মালদ্বীপ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাল। ১৬০০ সালে ২১৮ জন ইংরেজ বণিক নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রিটেনের রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে ১৫ বছরের সনদ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করতে আসে।<sup>৩০</sup> “১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপটেন হকিংস এবং ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার টমাস রো সন্ত্রাট জাহাজীরের রাজদরবারে তাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের প্রবাল বাধা সত্ত্বেও ব্যাপক বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। সুরাটে ইংরেজরা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে”।<sup>৩১</sup> ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের রাজা চার্লসের সঙ্গে

পতুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিন ব্রাগাঞ্জার বিবাহের ফলে যৌতুক হিসেবে বোম্বাই শহরটি লাভ করে। আর এভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৬৫১ সালে বঙ্গদেশের সুবেদার শাহ সুজা বাৎসরিক ৩০০০ টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময় ইংরেজদের এদেশে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ প্রদান করেন।<sup>১২</sup> ১৬৭২ সালে আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার গভর্নর শায়েস্তা খান ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। “১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চার্লকের জামাতা চার্লস আয়ার মজুমদার নামক পরিবারের কাছ থেকে সুতানটি, কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) এবং গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করে”।<sup>১৩</sup> ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভিত্তি স্থাপন ছিল বাংলায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রথম ধাপ এবং যার মাধ্যমে তারা সমগ্র ভারত উপমহাদেশ দখলের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়। এর সাথে যোগ হয় ১৭১৬ সালে মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়ারের ফরমান, যার ফলে তিনি কোম্পানির সুযোগ সুবিধা আরো বাড়িয়ে দেন। এটি ইংরেজ কোম্পানিকে বাৎসরিক পূর্বের তিন হাজার টাকা বাণিজ্যশুল্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার কর প্রদান থেকে মুক্ত করেন এবং কলিকাতার চারপাশের রাজ্যগুলো থেকে রাজনা নেয়ার অনুমতি প্রদান করে।<sup>১৪</sup> এভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য সমৃদ্ধি ঘটে এবং তারা বাংলার নবাবের ক্ষমতা করায়ত্ত করার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। নবাব সিরাজদৌল্লা বুঝতে পারে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের সহায়তায় করছে। ফলে নবাব ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে লালদীঘির যুদ্ধ (১৮ জুন, ১৭৫৬) এবং পলাশির যুদ্ধে (২৩ জুন, ১৭৫৭) লিপ্ত হতে বাধ্য হন। প্রথমটিতে সিরাজদৌল্লা জয় লাভ করলেও দ্বিতীয়টিতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এভাবেই পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।<sup>১৫</sup> ১৭৬০ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারি লাভ করে। এভাবে চার বছর কোম্পানি দেশের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার পর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনদ লাভ করে। বঙ্গারের যুদ্ধে মীর কাশিমকে পরাজিত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়। মোটামুটি এভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে দু’শো বছরের ঔপনিবেশিক যাত্রা শুরু করে।

১৭৫৭ সালে পলাশির বিজয়ের মাধ্যমে মূলত বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয়। এই ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়ী হয়েছিল দু’শো বছর (১৭৫৭-১৯৪৭)। ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের প্রধানকেন্দ্র কলিকাতাসহ

সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ব্যবসা, বাণিজ্য পশ্চিমা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

### (ঙ) কোম্পানি আমলে চিত্রকলার বিকাশ

কোম্পানি আমলে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব বলয়ে এই অঞ্চলের চিত্রকলায় ধীরে ধীরে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় যা 'কোম্পানি চিত্রকলা' নামে পরিচিত লাভ করে।<sup>১৬</sup> ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুদয় একদিকে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারতে সাংস্কৃতিক চিত্র পরিবর্তনের সূচনা হয়।<sup>১৭</sup>

কোম্পানি আমলে বাংলার মূলকেন্দ্র ছিল কলকাতা, তবে ঐতিহ্যগত কারণে ঢাকার গুরুত্ব সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যদিও ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের প্রভাবে ঢাকা তথা বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হয়। অপরদিকে এ অঞ্চলে বিস্তার ঘটে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে ঢাকার চিত্রকলায় যা কোম্পানি চিত্রকলার আস্ততায় পড়ে।

রাজনৈতিক দিক থেকে পলাশীতে ইংরেজদের হাতে সিরাজউদ্দৌল্লাহর পরাজয়ের মধ্যমে মুর্শিদাবাদে নবাবি শাসনের পতন ঘূরানিত হয়ে পড়ে। এর ফলে মুর্শিদাবাদের সমাজ সংস্কৃতিতে অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে এ সময়ে মূল মুর্শিদাবাদের শৈলী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমটি স্থানীয় জমিদার ও দেশীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পান্ডুলিপি ও জড়ানো পটচিত্রের উদ্ভব হয়, দ্বিতীয়টি ইংরেজ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় এবং ব্রিটিশ একাডেমিক শৈলীর চিত্ররীতির চর্চার উন্মেষ হয়। এ সময় মুঘল ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণে যে চিত্রকলার অঙ্কিত হয় তা কোম্পানি শৈলী বা কোম্পানি স্কুল বা কোম্পানি চিত্রকলা বলে পরিচিতি লাভ করে।<sup>১৮</sup>

কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলা প্রথম অঙ্কিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের তানজোরে(মাদ্রাস প্রেসিডেন্সী)। পরবর্তীতে এই শৈলীর চিত্র অঙ্কন করা হয় কলকাতা, পাটনা, লঙ্কৌ(অযাধ্যা), দিল্লী ও আগ্রায়।<sup>১৯</sup> ইংরেজ শাসকরা কয়েকটি বিশেষ কারণে দেশীয়(স্থানীয়)শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইংরেজী শিল্পীদের তুলনায় স্থানীয় শিল্পীরা ভারতীয় শিল্প পরম্পরা পুষ্ট নিসর্গদৃশ্য অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তারা ইংরেজ শিল্পীদের তুলনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে উন্নতমানের চিত্রকর্ম অঙ্কন করতেন।

তবে উপর্যুক্ত চিত্রগুলি ইংরেজদের আরোপিত পাশ্চাত্যের একাডেমিক শৈলীতে অঙ্কন করতে হত। অবশ্য প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, লঙ্কৌতে(অযোধ্যা)কোম্পানি আমলে শাসকরা এই স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা কিছু কিছু মুঘল পরম্পরা তথা শৈলীতে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

এভাবে কোম্পানি চিত্রকলার বেশ কয়েকটি ধারার সাথে পরিচিত ঘটে মুর্শিদাবাদে। প্রথমদিকে তারা হাতে তৈরী বিদেশি কাগজের ওপর জল রং অথবা গোয়াশ পদ্ধতিতে মিনিয়েচার অঙ্কন করেন। ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় নাগরিকদের এ প্রতিকৃতিগুলিতে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক মুঘলরীতি ও পাশ্চাত্যের চিত্রাদর্শের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ধারাটিতে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকদের নির্দেশে স্থানীয় শিল্পীরা ভারতীয় নবাব ও সামন্ত প্রভুদের গুচ্ছ প্রতিকৃতি করেন। উক্ত প্রতিকৃতিগুলি মূলত ব্রিটিশ শিল্পরীতির পরিচায়ক। তৃতীয় ধারাটি কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী। মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের কারণে একে বলা হতো 'মাইকা চিত্র'।<sup>৩৯</sup> এটি অস্ত্রের উপরে আঁচড় কেটে অথবা রেখাচিত্র অঙ্কন করা হত অতঃপর কাচের উপর রেখাচিত্র ফুটে তোলা হত। এই 'মাইকা চিত্র' মুর্শিদাবাদে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং স্থানীয় ধর্মীয় উৎসবে আলোকসজ্জার কাজে ব্যবহৃত হত। কোম্পানি চিত্রকলার আওতায় যেসকল শিল্পীরা চিত্রশিল্পের চর্চা করত তারা প্রধানত ইউরোপ থেকে আমদানি করা কাগজ ব্যবহার করত।

মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব যখন ধীরে ধীরে কমে আসছিল সেসময় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা কেউ কেউ আশ্রয় পেয়েছিল ঢাকায় নায়েবে নাজিম নুসরাত জঙ্গের সময়কালে (১৭৮৬-১৮২২ খ্রি.)। সেই সময় ঢাকায় বসবাসকারী অন্তত একজন শিল্পীর নাম জানা যায়। তিনি আলম মুসাব্বির (Alam -Musavir)। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত সেই সময়কার কিছু জলরঙচিত্রের মধ্যে আছে ১৭টি ঈদের মিছিল ও মেলার ছবি এবং ২২টি মহরমের মিছিলের ছবি। "এগুলো আলম মুসাব্বির-এ আঁকা বলে মনে করা হয়"।<sup>৪০</sup>

ঔপনিবেশিক শাসনের গুরুর প্রথম দিকে অর্থাৎ কোম্পানি আমলে এদেশে ও ইংরেজদের ভেতর এই দেশ সম্পর্কে কৌতূহল ছিল প্রবল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে মুঘল পরম্পরার দেশি শিল্পীদের অনেকে রোজগারের আশায় জমায়েত হয়েছিল নতুন শহর রাজধানী কলকাতায়। ইংরেজদের অনেকেই নিজেদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী এসকল দেশি(স্থানীয়)শিল্পীদের দিয়ে চিত্র অঙ্কন করাতেন। এই চিত্রাঙ্কন চর্চা অব্যাহত ছিল একশ বছর অর্থাৎ ফটোগ্রাফি প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত।



কোম্পানি শাসনামলে দেশিয় শিল্পীদের নিয়োগ দেওয়া ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের পত্নী মিসেস ইম্পে। মিসেস ইম্পে তাঁর সংগ্রহশালার পশুপাখির ছবি আঁকার জন্য পাটনা ঘরানার তিনজন দেশি শিল্পী নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে থেকে জৈনুদ্দিন ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। “ইংল্যান্ডে তৈরি হোয়াইটম্যান কাগজে স্বচ্ছ জলরঙে তিনি যেসব পশু-পাখির ছবি এঁকেছেন তা শুধু জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, নান্দনিক বিচারেও উল্লেখযোগ্য।”<sup>৪১</sup> মিসেস ইম্পে ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন ইংরেজ পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় শিল্পীদের নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা এসব দেশিয় শিল্পীর নানা বিষয় চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। যেমন-শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ফল-ফুল-লতা-পাতার ছবি, ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুরের ‘ইনস্টিটিউট অব প্রোমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’র পশুশালার পশুপাখির ছবি এঁকেছিলেন অনেক ভারতীয় শিল্পী।<sup>৪২</sup> প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যের ছবি ও নকশা আঁকার কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন এ সকল শিল্পীরা।

কোম্পানি শৈলীর চিত্রকরেরা নানান পেশার মানুষজনের ছবি এঁকেছিলেন। এগুলো দিয়ে সেট তৈরি কিছু সেট বর্তমানে সংরক্ষিত রয়েছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরি) ও অন্যান্য সংগ্রহশালায়।

কোম্পানির শৈলীর চিত্রকলার শেষ পর্যায়ের আরেকজন নামকরা চিত্রশিল্পী ছিলেন শেখ মুহম্মদ আমীর। তিনি ইংরেজ ও ইউরোপীয় বাবুদের পছন্দ অনুযায়ী ফরমাইশি ছবি আঁকতেন। যে সকল ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে রয়েছে সাহেব, পোষা কুকুর, ঘোড়ার পিঠে সাহেবের মেয়ে, দিঘিসহ সাহেবের এস্টেট ও বাগানবাড়ি ইত্যাদি। তাঁর চিত্রগুলোতে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হল এগুলোতে মুঘল পরম্পরা ও পশ্চিমা পরম্পরার সার্থক সংযোগ ঘটেছিল।

মুঘল ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণে অঙ্কিত কোম্পানি শৈলী বা কোম্পানি চিত্রকলা মুর্শিদাবাদে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। ফলে শিল্পরীতির পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব, ভারতে রেল ব্যবস্থার প্রবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ক্যামেরা আবিষ্কারের ফলে চিত্রকরদের দিয়ে দৃশ্য অঙ্কনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নেওয়া কোম্পানি চিত্রকলার প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়।<sup>৪৩</sup>

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, “বিশেষত পঞ্চাশের দশকের পর ফটোগ্রাফির প্রচলন শুরু হলে কোম্পানি শৈলীর অবনতি ঘটতে থাকে। মিলড্রেড আর্চারের মতে উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কোম্পানির শৈলী প্রবাহমান ছিল।”<sup>৪৪</sup>

### (চ) ভারতে ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীদের সমাগম

“পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রি.) বারো বছর পর থেকে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শিল্পীদের সমাগম শুরু হয়। ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে শিল্পী টিলি কেটল এর আগমন থেকে এই অভিযানের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৭৭০-১৮২০ খ্রি.) প্রায় ৬০ জন শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন বলে জানা যায়।”<sup>৪৫</sup> অবশ্য উইলিয়াম ফস্টারের মতে, ১৭৬০-১৮২০ এই কাল পর্বে ভারতে শুধু ব্রিটিশ শিল্পী এসেছিলেন ৬১ জন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পীদের সংখ্যা ২৮।<sup>৪৬</sup> উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে আগত বিপুল সংখ্যক শিল্পীরা বেশিরভাগই ভাগ্যাশ্বেষে এদেশে পর্দাপন করেছিলেন। তবে এর পিছনে মূল কারণ ছিল ইংল্যান্ডে তথা স্বদেশে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

এই ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমভাগে ছিলেন তেল রঙে একাডেমিক রীতির শিল্পীরা। “এই ধারার শিল্পীদের মধ্যে টিলি কেটল (১৭৪০-৮৬), জন জোফানি (১৭৩৩-১৮১০), আর্থার ডেভিস (১৭৬৩-১৮২২), টমাস হিকি (১৭৬০-৯০), রবার্ট হোম (১৭৫১-১৮৩৮), ফ্রানচেস্কো রেনাল্ডি (রেনাল্ডি ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে অল্পদিনের জন্য ঢাকাতেও এসেছিলেন) প্রমুখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।”<sup>৪৭</sup>

দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন মিনিয়েচার শিল্পী, এরা হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার অঙ্কন করায় পারদর্শী ছিলেন। কারণ তারা ইউরোপে হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার আঁকার পরম্পরা শিল্পী ছিলেন। উক্ত ধারার বিদেশি চিত্রকরদের মধ্যে ছিলেন জন স্মিট, ওজিয়াস হামফ্রে, স্যামুয়েল এন্ড্রুজ ও ডায়না হিল প্রমুখ। এ ধারার শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত জর্জ চিনারী(ভারতে অবস্থান; ১৮০২-১৮২৫)। চিনারী কিছু দিন ঢাকাতেও অবস্থান করেন (জুলাই ১৮০৮-১৮১১)। তেল রঙের ছবিতেও তার যথেষ্ট দক্ষতা ও খ্যাতি ছিল।

তৃতীয় ধারার শিল্পীরা প্রধানত ব্রিটিশ পরম্পরায় স্বচ্ছ জলরঙে চিত্রাঙ্কন করতেন। এই চিত্রগুলি এনগ্রেভিং, একোয়াটিন্ট বা লিথো পদ্ধতিতে অ্যালবামে ছাপানো হত। এই ধরনের চিত্রকর্মগুলো

ইংল্যান্ডে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ ধারা শিল্পীরা মানুষের অবয়ব, জীবনযাত্রা, অভিজাতবর্গের জীবনাচারণ বিষয়ে চিত্রাঙ্কণ করতেন। ভারতে আগত উইলিয়াম হজেস ভারতে অবস্থানকালীন বহু স্কেচ আঁকেন। এই সব স্কেচ অবলম্বনে প্রকাশ করেন এনথ্রোড প্রিন্টের অ্যালবাম 'সিলেট্ট ভিউজ অব ইন্ডিয়া' (১৭৮৬) এবং 'ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া' (১৭৯৩)। কোম্পানি আমলে এই ধারার ছবি এঁকে যারা বিখ্যাত হন তাদের মধ্যে ছিলেন টমাস ড্যানিয়েল (১৭৪৯-১৮৪০) এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েল (১৭৬৯-১৮৩৭) জেমস মোকট ও বালখাজার সলভিন-এরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বেশ কয়েকজন শৌখিন চিত্রকর এসময় এদেশের নানা বিষয় নিয়ে চিত্রে অঙ্কন করে। এদের মধ্যে সিভিলিয়ান চার্লস ড'য়েলী (১৭৮১-১৮৪৫) 'ভিউজ অব ক্যালকাটা' (১৮৪৮) এবং 'অ্যান্টিকুইটিস অব ঢাকা' (১৮১৪) গ্রন্থ দু'টি শহরের স্থাপত্যকর্ম ও পুরাকীর্তির প্রমান রেখে গেছেন। আরেক শৌখিন শিল্পী উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন (১৭৬৩-১৮৩৯) রাজমহল থেকে গৌড় পর্যন্ত ভ্রমণ করে পাণ্ডুর আদিনা ও গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের ছবি এঁকেছিলেন। জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিনসন ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স বাহিনীর ক্যাপ্টেন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ক্যাম্পেন ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে ২৬টি ছবির মাধ্যমে তিনি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়টি চিত্রিত করে গেছেন, অবশ্যই ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব চিত্র অঙ্কন করেন। এছাড়া কোম্পানি আমলে বাংলায় আরো অনেক শৌখিন চিত্রশিল্পী বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কারণে কাজ করেছেন।

#### (ছ) কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা

কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত বিদেশি শিল্পীরা এবং ঢাকায় অবস্থানরত স্থানীয় শিল্পীরা সমসাময়িক সে সময়কার ঢাকায় যে সকল চিত্র অঙ্কণ করেছেন তার বিষয়বস্তু ছিল কোম্পানি আমলে এই শহরের পরিবেশ ও তার মানুষগুলো। তবে তাদের চিত্রে ধরা পড়ে ঐতিহাসিক নগরী ঢাকার গৌরব ও দুঃসময় এবং উত্থান ও পতনের ইতিহাস।

ঢাকা চিত্রকলার চর্চার যেসব বিবরণ পাওয়া যায় যে, আঠারো শতকের শেষের দিকে বেশ ক'জন বিদেশী ও স্থানীয় শিল্পীরা শিল্পচর্চায় রত ছিলেন। তাদের মধ্যে ফ্রানসেসকো রেনালডি, চার্লস ড'য়লি, চিনারি, আলম মুসাব্বিরসহ আরো বেশ কিছু নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঢাকার চিত্রকলা প্রতিবেশী অন্যান্য কোম্পানি স্কুল, যেমন: পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও বেনারসের চিত্রশিল্প থেকে ছিল একেবারে আলাদা। এ স্কুলের চিত্রশিল্পে নিজস্ব লোকজ বৈশিষ্ট্য অথবা শুধু ব্রিটিশ বৈশিষ্ট্য কোনটিই ছিল না। তবে মুঘল বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বেশ লক্ষ করা যায়। ঢাকায় নবাব নুসরত জঙ্গের সময়কালে আলম মুসাব্বিরের আঁকা ঈদ ও মহরররম মিছিলের কিছু চিত্র পাওয়া যায় যেগুলোতে অবক্ষয়ের ছাপ দেখা যায়। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায় যে, এ পর্যায়ে আমরা যে সকল চিত্রকর্ম পাই তা উক্ত স্কুলের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে সৃষ্টিকর্ম এবং এর পূর্ববর্তীকালের চিত্রকর্ম সম্ভবত আবহাওয়াজনিত অথবা যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেশকিছু পণ্ডিত ভারতীয় শিল্পীদের ওপর ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের প্রভাব এবং সুপরিচিত কোম্পানি স্কুলের উদ্ভবের ওপর কাজ করে গেছেন।“ এটাকে যদিও কোন প্রধান ধারা বা স্কুল বলে আখ্যায়িত করা চলে না, তথাপি দুশতাব্দীর চিত্রশিল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনে এর একটা গুরুত্ব আছে।”<sup>৪৮</sup>

উপর্যুক্ত আলোচিত অধ্যায়ে ঢাকা, ঢাকা শহর হিসাবে গড়ে ওঠার ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানি শাসনের সূত্রপাত, কোম্পানি শাসনের আন্ততায় ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানি চিত্রকলার বিকাশ পাশাপাশি পূর্ব বাংলার ঢাকা অঞ্চলে স্বল্প পরিসরে কোম্পানি চিত্রকলার চর্চা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

**তথ্য নির্দেশ:**

১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া, খন্ড-৪*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৮০
২. <http://bn.wikipedia.org/wiki/ঢাকা/পৃ-১>
৩. শামীম আমিনুর রহমান, *শিল্পীর চোখে ঢাকা (১৭৮৯-১৯৪৭)*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ৩০
৪. শাওন আকন্দ, 'ঔপনিবেশিক যুগ' (১৭৫৭ -১৯৪৭), সূফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-০২*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৭৯.
৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯
৬. ফয়েজুল আজিম, 'চিত্রকলা'-প্রস্তর যুগ থেকে পরবর্তী মধ্যযুগ', সূফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৭৮.
৭. ফয়েজুল আজিম ও আবুল মুনসুর, 'কোম্পানি শৈলী ও ভারতে আগত বিদেশী চিত্রকর', লালারুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১৪
৮. শামীম আমিনুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

**তথ্যনির্দেশ:**

১. A. H. Dani, *Dhaka A Record of it's Changing Fortunes,( New Ed.)*, Dacca: Mrs. Sufia's Dani, 1962, p. 11
২. The Far Eastern Economic Review (1982), *All Asia Guide, 12<sup>th</sup> ed*, pub. Hongkong: Far Eastern Economic Review Ltd., p. 33
৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ১২
৪. [http://bn.wikipedia.org/wiki/ঢাকা/পৃ. ১](http://bn.wikipedia.org/wiki/ঢাকা/পৃ.১)
৫. Abdul karim, *Dacca, the Mughal Capital*, Dacca: 1964, p.13
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
৮. হাকীম হাবিবুর রহমান, *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে*, ভাষান্তর- মো: রেজাউল করিম, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ.
৯. [http://bn.wikipedia.org/wiki/ঢাকা/পৃ. ৫](http://bn.wikipedia.org/wiki/ঢাকা/পৃ.৫)
১০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-০৪*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭৯
১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
১৩. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৬৬
১৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড -০৪*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৯২
১৫. মনোয়ার আহমেদ, *ঢাকার পুরোনো কথা*, ঢাকা: মাওলা বাজার্স, ২০০৮, পৃ. ১৩
১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
১৮. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

২০. James Taylor, *Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840, p. 366
২১. S.M Taylor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dhaka, 1956(2<sup>nd</sup> ed.), pp. 18-21
২২. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৭০
২৩. মনোয়ার আহমদ, *ঢাকার পুরোনো কথা*, ঢাকা: মাওলা বাব্বার্স, ২০০৮, পৃ. ২০-২১
২৪. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাণ্ডু*, পৃ. ১৭০
২৫. মনোয়ার আহমদ, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ২৭-২৯
২৬. *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৩২
২৭. শামীম আমিনুর রহমান, *শিল্পীর চোখে ঢাকা (১৭৮৯-১৯৪৭)*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১০
২৮. পারভীন হাসান, “স্থাপত্য ও চিত্রকলা” সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) গ্রন্থে সংকলিত, (৩য় খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০. পৃ. ৪৬০
২৯. এ. বি. এম হোসেন (সম্পা.), *আধুনিক যুগ (ঐতিহাসিক পটভূমি), স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -২*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৩৩৩
৩০. কে. এম. রাইচউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিচয় (প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, নবম সংস্করণ: জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯০
৩১. এ. বি. এম হোসেন (সম্পা.), *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫
৩২. আখতারুজ্জামান, রাষ্ট্রগঠন পর্ব-মধ্যযুগ, এমাজউদ্দিন আহমদ ও হারুন-অর-রশীদ (সম্পা.), *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৬০
৩৩. হারুন-অর-রশীদ, রাষ্ট্রগঠন পর্ব-ঔপনিবেশিক শাসন আমল, এমাজউদ্দিন আহমদ ও হারুন-অর-রশীদ (সম্পা.), *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৬৪
৩৪. Sirajul Islam, *History of Bengal: Colonial administration (Bangla)*, Dhaka: Chayanika 2002, p. 13

৩৫. এ. বি. এম হোসেন (সম্পা.), আধুনিক যুগ (ঐতিহাসিক পটভূমি), *স্বাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫
৩৬. ফয়েজুল আজিম, চিত্রকলা- প্রস্তরযুগ থেকে পরবর্তী মধ্যযুগ, মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৭৮
৩৭. শাওন আকন্দ, 'ঔপনিবেশিক যুগ-১৭৫৭ -১৯৪৭', মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৮১
৩৮. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৬০
৩৯. ফয়েজুল আজিম ও আবুল মুনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
৪০. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ১৫
৪১. শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯
৪২. অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*,
৪৩. ফয়েজুল আজিম ও আবুল মুনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
৪৪. R.P Gupta, 'Art in old Calcutta', in Sukanta Chaudhary (ed.), *Calcutta the Living City*, Vol-1(New Delhi, 1990), p. 138
৪৫. প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা: অমল গুপ্ত অয়ন, ১৯৭৮, পৃ. ১০
৪৬. ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২০-২২
৪৭. শাওন আকন্দ, 'ঔপনিবেশিক যুগ-১৭৫৭ -১৯৪৭', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯
৪৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) , *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড -৩ ,ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩৫৮



## দ্বিতীয় অধ্যায়

কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত বিদেশী চিত্রকর

ও স্থানীয়-অস্থানীয় শিল্পীদের জীবনী ও তাদের অঙ্কিত চিত্রের পরিচিত

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত বিদেশী চিত্রকর

#### ও স্থানীয়-অস্থানীয় শিল্পীদের জীবনী ও তাদের অঙ্কিত চিত্রের পরিচিতি

ভারতে কোম্পানি শাসনের শুরুতে বহু ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পী এখানে এসেছিলেন। আগত এ শিল্পীদের সকলেই যে স্বদেশে বিখ্যাত ছিলেন, তা নয়। মূলত সামান্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন মধ্যম কিংবা নিম্নমানের চিত্রকর। এ শিল্পীদের মাঝে পেশাদার ছাড়া বেশকিছু শৌখিন চিত্রকরও ছিলেন। কোম্পানি আমলে আগত ইংরেজ ও ইউরোপীয় পেশাদার ও শৌখিন শিল্পী এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বাংলা অঞ্চলের দেশীয় শিল্পীরা ঢাকায় এসেছিলেন। এসকল শিল্পীর আঁকা চিত্রকলা ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ। “এ চিত্রকলা ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের মূল দলিল। মূলত ভারতে আগত শিল্পীদের আলোচনা ছাড়া কোম্পানি চিত্রকলার সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়...”<sup>১</sup> ভারতের আগত ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে যারা ঢাকায় এসেছিলেন ও দেশীয় শিল্পী যারা ঢাকাকে নিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তারাই আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

**চার্লস ড'য়লি (জন্ম- ১৭৮১ খ্রি., মৃত্যু- ১৮৪৫ খ্রি.)**

সণ্ডম ব্যারোনেট, ভারতীয় সিভিলিয়ান ও চিত্রশিল্পী, ইপসুইচের (Ipswich) পার্লামেন্ট-সদস্য স্যার চার্লস ড'য়লি (১৭৮১-১৮৪৫) ভারতে মুর্শিদাবাদে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।<sup>২</sup> ড'য়লির পিতা ব্যারন স্যার জন হেডলি ড'য়লি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর আলীর দরবারে কোম্পানির আবাসিক কর্মকর্তা। পিতার চাকরির সুবাদে ড'য়লি শৈশবের কিছুটা সময় ভারতে কাটিয়েছিলেন এবং ১৭৮৫ সালের দিকে তার পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে তার শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তীতে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্জেন্ট হিসাবে চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার আপিল আদালতের রেজিস্টারের সহকারি হিসাবে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নিয়োগ লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের অফিসের নথি-সংরক্ষক বা রেকর্ডকিপার, ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার কালেক্টর, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সরকারী কাস্টমস ও পৌরকরের কালেক্টর, ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের

অফিস এজেন্ট, ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট এবং সর্বশেষে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কাস্টমস, লবণ ও আফিম বোর্ড এবং মেরিন বোর্ডের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ভারতে অবস্থানের পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৮৩৮ সালে দেশে ফিরে যান। ১৮৪৫ সালের দিকে ইতালিতে বসবাসরত অবস্থায় লেগহর্নের কাছে আর্দেঞ্জা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।<sup>৭</sup> বিশেষত, বিশপ হেবার তার *Narratives of a Journey through the upper Provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-25* শীর্ষক গ্রন্থে ড'য়লীর ভূয়সী প্রশংসা করেন; তিনি বলেছিলেন, ড'য়লী হচ্ছেন “best gentleman artist I ever met with”.

ড'য়লি পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু তুলি চালনায় তার কিছু দক্ষতা ছিলেন। তিনি ছিলেন সিভিলিয়ান। কর্মের উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ বছর এদেশে বাস করেছেন। এদেশ, এদেশের মানুষ ও চাকুরিজীবী ইংরেজদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁর অঙ্কিত চিত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

ড'য়লির চিত্রকর্মের কতিপয় সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ‘দ্য ইউরোপীয়ানস ইন ইন্ডিয়া,’ ‘অ্যান্টিকুইটিস অব ঢাকা,’ ‘স্কেচেস অন দ্য নিউ রোড,’ ‘ইন্ডিয়ান স্পোর্টস,’ ‘ভিউজ অব ক্যালকাটা,’ ‘বিহার অ্যামেচার লিথোগ্রাফিক স্ক্যাপবুক,’ ‘দ্য কন্সটিউমস অ্যান্ড কাস্টমস অব মর্ডান ইন্ডিয়া’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চার্লস ড'য়লি ঢাকার কালেক্টর পদে থাকাকালে (১৮০৮-১১) বিচিত্র বিষয়ে চিত্র এঁকেছিলেন, বিশেষত মুঘল স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের ছবি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, এগুলো দিয়ে একটা ফোলিও – বুক প্রকাশ করবেন। তবে ১৮১৪ সাল থেকে ড'য়লির এসব খোদাইকর্ম ও ড্রয়িং লন্ডনে প্রকাশ হতে শুরু করার পর প্রতি পর্বের সঙ্গে ঢাকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার কারণে সিরিজটি একটি বৃহদায়তন ফোলিওবুকের রূপই পেয়েছিল। সংযুক্ত ইতিহাস বর্ণনাগুলো লিখেছিলেন জেমস অ্যাটকিনসন। বইয়ে খোদাইকর্মগুলো করে দিয়েছিলেন জন ল্যান্ডসিয়ার। ফোলিওগুলো একত্রে *অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা* নামে পরিচিত লাভ করেছিল, যা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলিল। এতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।<sup>৮</sup>

জর্জ চিনারী (জন্ম- ১৭৭৪ খ্রি., মৃত্যু- ১৮৫২ খ্রি.)

জর্জ চিনারী ১৭৭৪ সালের লন্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভূদৃশ্যাবলি ও প্রতিকৃতি আঁকতেন। তিনি মিনিয়েচার ও তেল রঙের চিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার ছবি আঁকা তার সমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।<sup>৫</sup> চিনারী অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে লন্ডন, ডাবলিন প্রভৃতি স্থানে বেশ কিছু চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

অতঃপর চিনারী ১৮০২ সালে ভারতের মাদ্রাজে পৌঁছে, সেখানে পাঁচ বছর বসবাস করেন। ১৮০৭ সালের তিনি কলকাতা চলে আসেন এবং সেখানে ড'য়লির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেছিল। তিনি ড'য়লির আমন্ত্রণে ঢাকায় আগমন করেন ১৮০৮ সালে। H.E.A. Cotton সাহেবের কলকাতা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে লেখা এক চিঠিতে ড'য়লি তাঁকে জানাচ্ছেন, তিনি শিল্পী চিনারীর কাছ থেকে নিয়মিত ছবি আঁকায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।<sup>৬</sup>

ঢাকায় শুধু ড'য়লিই ছবি আঁকেননি, চিনারিও বেশ কিছু ছবি আঁকেছিলেন। গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ ছিল চিনারির। তিনি তাঁর চিত্রকর্মে প্রকৃত ভারতীয় জীবনের ছবি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। চিনারির সঙ্গে থেকে ড'য়লির গ্রামবাংলার ছবি আঁকার আগ্রহ বেড়ে যায়। চিনারির অঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ করা যায় ড'য়লির চিত্রকর্মে।<sup>৭</sup> চিনারি ঢাকায় কিছু দিন থাকার পর কলকাতায় ফিরে যান তবে পরে তিনি আবার ঢাকায় এসেছিলেন কিনা জানা যায় না। ১৮২৪ সালে ঢাকায় আগত পাদ্রি রেজিন্যান্ড হেবার নবাব শামসুদ্দৌলাহর বাড়িতে চিনারির আঁকা নবাবের নিজের এবং নবাব নুসরত জঙ্গের দুটি প্রতিকৃতি দেখতে পেয়েছিলেন।<sup>৮</sup>

ঢাকায় আঁকা চিনারির আরও কিছু প্রতিকৃতি (portrait) কথা জানা যায়। যাদের প্রতিকৃতি তিনি আঁকেছিলেন তাঁরা হলেন: “চার্লস ড'য়লি ও তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়ন ড'য়লি, ঢাকা ব্যাটালিয়ন কমান্ডার জর্জ ক্রেনটেনডেন, ঢাকা সিটি কোর্টের জজ শেরম্যান বার্ড, ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কোর্ট অব আপিলের তৃতীয় জর্জ জেমস রোখভেন, ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট সহকারী চার্লস রবার্ট লিন্ডসে প্রমুখ।”<sup>৯</sup> জর্জ চিনারির তিনটি ভিনেট বা ক্ষুদ্র ছবি ড'য়লি ব্যবহার করেছেন তাঁর অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকায়।

চিনারির অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। মাত্র সতের বছর বয়সে রয়েল একাডেমিতে তাঁর চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়েছিল। জানা যায় যে, জর্জ চিনারি বিচিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ছবির ক্রেতাদের সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন না। ভারতে তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী

হয়েছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি। সে আমলের ৪০ হাজার পাউন্ড দেনা পরিশোধ করতে না পেরে তিনি ভারত থেকে চীনের ম্যাকাও দ্বীপে পালিয়ে যান। ১৮৫২ সালে ৭৮ বছর বয়সে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**রবার্ট হোম (জন্ম- ১৭৫২ খ্রি., মৃত্যু- ১৮৩৪ খ্রি.)**

রবার্ট হোম লন্ডনের হাল শহরে ১৭৫২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা রবার্ট বায়ার্ন হোম ছিলেন সেনাবাহিনীর ডাক্তার আর মা মেরি হাচিনসন ছিলেন সেন্ট হেলেনার গভর্নর কর্নেল হাচিনসনের কন্যা।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আঁকা ছবি রয়েছে। আঠারো-উনিশ শতকে এদেশে আসা ইংরেজ শিল্পীর মধ্যে তাঁর আঁকা ছবি বেশি রয়েছে।, পার্ক স্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন হলই তার আঁকা কমপক্ষে ২৫টির বেশি ছবি আছে। এছাড়াও তার আঁকা প্রতিকৃতি (portrait) ছিল দিল্লি, সিমলা ও বেলডেভিয়ারের ভাইসরয়ের প্রাসাদে, কলকাতার গভর্নর হাউসে, মাদ্রাসের ব্যাঙ্কুয়েট মেমোরিয়ালে, কলকাতার টাউন হলে, হাইকোর্ট এবং ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে।<sup>২০</sup>

রবার্ট হোম ১৭৯১ সালে প্রথমে ভারতের মাদ্রাজে আসেন। তিনি মাদ্রাজে এসেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে চিত্রশিল্পীর পেশা চর্চা করার উদ্দেশ্যে। পরে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্ণৌ ও কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি খুব সুন্দর প্রতিকৃতি আঁকতেন। বিশপ হেবার তাঁর জানার্লে লেখেনঃ “হোম যদি ইউরোপ থাকতেন তাহলে একজন বিশিষ্ট শিল্পী হতে পারতেন। তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল এবং ড্রয়িং ছিল খুব ভালো এবং দ্রুত। প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি অতি উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করতেন...”<sup>২১</sup> তিনি ১৭৯৫ সালে মিস এ প্যাটারসনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাদ্রাজে থাকাকালে ‘সিলেট্ট ভিউজ ইন মাইশোর’, ‘দ্য কানট্রি অব টিপু সুলতান’, ‘ভিউজ অব শ্রীরঙ্গপুত্র’, ‘দ্য ক্যাপিটাল অব টিপু সুলতান’ প্রকাশিত হয়।

ঢাকায় আঁকা অষ্টাদশ শতকের তেলরং-চিত্রের মাত্র দুটি ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর একটি এঁকেছিলেন রবার্ট হোম। ছবিটির নাম ‘ভিউ অব দ্য গেট অব দ্য লালবাপ’।<sup>২২</sup>

বাংলাদেশে আঁকা হোমের আরেকটি চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৭৯৯ সালের আগস্টে ঢাকা থেকে কলকাতা ফেরার পথে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সেখানকার কর্মশিল্পাল রেসিডেন্ট মি. এডমন্ড পিটস মিডলটনের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন হোম।<sup>২৩</sup> ১৮১৪ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ আসেন

এবং লক্ষ্মীর নবাব গাজীউদ্দিন হায়দারের দরবারে প্রায় তের বছর শিল্পী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নবাবের মৃত্যুর পর তিনি কানপুরে চলে আসেন। ১৮৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে হোম সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

“যদিও চিত্রশিল্পী হিসেবেই পরিচিত ছিল হোম, কিন্তু তিনি কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কাজও করেছিলেন, যথা – রাজকীয় শকট, নৌকা এবং হাওদার ডিজাইন রচনা করেন। এছাড়া তিনি সরকারি নির্মাণ-কার্য তদারকি করেন এবং রাষ্ট্রীয় মণি-রত্ন সেটিং করেন।”<sup>১৪</sup>

**আর্থার লয়েড ক্রে (জন্ম- ১৮৪২ খ্রি., মৃত্যু- ১৯০৩ খ্রি.)**

আর্থার লয়েড ক্রে ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডন স্কুলের পড়াশুনা শেষে তিনি কেমব্রিজ থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। ব্যবসায়ী পিতার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শেষে তিনি পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনা করবেন। কিন্তু ক্রে-র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই তিনি সিভিলিয়ানের চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন ১৮৬২ সালে। প্রশিক্ষণের পর প্রথমে তাঁকে চট্টগ্রামে সহকারী বা এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারপর তিনি বিভিন্ন স্থানে বদলি হন। এ সূত্র ধরে ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি স্বল্প সময়ের জন্য তিনি ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর এ. লেভিন-এর অনুপস্থিতিতে কালেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।<sup>১৫</sup> সিভিলিয়ান হিসেবে এদেশে আসার পর ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করেন ক্রে। চাকরির সুবাদে বাংলার বিভিন্ন স্থানের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেন ‘*লিভস ফ্রম আ ডায়েরী ইন লোয়ার বেঙ্গল*’।<sup>১৬</sup> সি. এস ছদ্ম নামে লেখা তাঁর এ রচনাটি লন্ডনের ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি এটি প্রকাশ করে। তার এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় জুড়ে স্থান পেয়েছে ঢাকা প্রসঙ্গ এবং ঢাকার ওপর বেশ কিছু ড্রয়িং। বিশেষ করে, সিপাহি যুদ্ধের সময় লালবাগে সেনাদের অবস্থান দেখিয়ে একটি মানচিত্র, লালবাগের দুর্গ, ঢাকা জেলের ভেতর কয়েদিদের চিত্র, বরাহ নিধন ও চর পরিদর্শন-এর দৃশ্যগুলো উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলোর স্কেচিং করেছিলেন রবার্ট ফ্যারন। সিভিলিয়ান হিসেবে কর্মজীবন শেষে তিনি ইংল্যান্ডে অবসর জীবন কাটান এবং ১৯০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

## ফ্রান্সিসকো রেনাল্ডি (অষ্টাদশ শতক)

ঢাকায় আসা ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ছবিটির শিল্পী ফ্রান্সিসকো রেনাল্ডি। তাঁর পূর্বজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ১৭৭৬ সালে লন্ডনের রয়েল একাডেমি স্কুলে ভর্তি হন তিনি। ১৭৮১ সালে তিনি ইতালিতে গমন করেন। সেখানে তিনি দু'বছর অবস্থানের পর ১৭৮৩ সালে লন্ডনে চলে আসেন। যদিও প্রতিকৃতি অঙ্কন করে তিনি লন্ডনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। তখন ভারতে তাঁর ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করেন এবং ১৭৮৬ সালের দিকে কলকাতায় আসেন। ভারতে দশ বছর অবস্থানকালে রেনাল্ডি কলকাতা, লক্ষ্মী ও ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। রেনাল্ডি ১৭৮৯ সালে দিকে ঢাকায় অবস্থানকালে এদেশীয় এক নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে ছিলেন এবং প্রতিকৃতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'এক মুসলিম বিবি'। ১৭৯৬ সালে রেনাল্ডি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। পরের বছর লন্ডনে রয়েল একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীতে তার তিনটি ছবি স্থান পায়। দুটি 'হিন্দুস্থানি নারী' ও একটি 'মোগল নারী'।<sup>১৭</sup> জানা যায় যে, তিনটি ছবিই ভারতীয় নারীদের।

‘ঢাকায় আঁকা রেনাল্ডির ‘নাবুব’ ও তাঁর ‘রহস্যময়ী বিবি’ সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। ঢাকার চিত্রকলার ইতিহাসে আজও এসকল নারীদের পরিচয় রহস্যময়।’<sup>১৮</sup>

## ফ্রেডরিক উইলিয়াম আলেক্সান্ডার ডি ফেবেক (জন্ম- ১৮৩০ খ্রি., মৃত্যু- ১৯১২ খ্রি.)

ফ্রেডরিক উইলিয়াম আলেক্সান্ডার ডি ফেবেক ছিলেন সিভিলিয়ান এবং শৌখিন চিত্রশিল্পী। ফ্রেডরিক উইলিয়াম আলেক্সান্ডার ডি ফেবেক ১৮৩০ সালের জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসে পড়াশোনা করেন। সহকারী সার্জন হিসেবে ১৮৫৮ সালে ভারতের বেঙ্গল সার্ভিসে যোগ দেন। চাকুরিতে থাকাকালে ফেবেক ঢাকার বেশ কিছু ছবি আঁকেন। ঢাকা বিষয়ক তাঁর চারটি চিত্র ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট জাদুঘরে সংরক্ষিত। ছবিগুলো হল : ‘নিমতলী প্রাসাদের ভগ্নপ্রায় গেট’, ‘বুড়িগঙ্গা তীরের দৃশ্য’, ‘পুরান ঢাকার খান মৃধার মসজিদ’ ও ‘বড় কাটরার গেটের দৃশ্য’। ছবি চারটি জলরঙে আঁকা। ডি ফেবেকের আঁকা নিমতলীর গেটের চিত্রটিতে আমরা এর আদিরূপটির সন্ধান পাই।<sup>১৯</sup>

জোসেফ স্কট ফিলিপস (জন্ম- ১৮১২ খ্রি., মৃত্যু- ১৮৮৪ খ্রি.)

সিভিলিয়ান জোসেফ স্কট ফিলিপস (১৮১২-১৮৮৪) ছিলেন দমদমে সুপারনিউমেরারি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। জোসেফের ৪৬টি ছবি সংবলিত একটি অ্যালবামের সন্ধান পাওয়া গেছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পেনসিল স্কেচ ও জলরঙে আঁকা চিত্র। এসব ড্রয়িংয়ের বেশিরভাগ আঁকা হয়েছিল সুন্দরবন থেকে ঢাকায় যাত্রা পথে। ১৮৩৩ সালে বাংলা অঞ্চলে অবস্থানকালে আঁকা বিভিন্ন ড্রয়িংও রয়েছে এই অ্যালবামে। একই বছরের বর্ষাকালের কোন এক বিকেলের বৃষ্টিলাত রমনাকে শিল্পী জলরঙে এঁকেছিলেন। উক্ত জল রং-এর চিত্রে তৎকালীন রমনার রেসকোর্সে অবস্থিত বিখ্যাত মন্দির ও পুরোহিতের চৌচালা ঘরটির আদিরূপটি ফুটে ওঠেছে।<sup>২০</sup>

হেনরি ব্রিজেস মোলসওয়ার্থ (জন্ম- ১৮৫৫ খ্রি., মৃত্যু- ১৯৫৪ খ্রি.)

হেনরি ব্রিজেস মোলসওয়ার্থ ১৮৬৯ সালে ব্রিটিশ রয়েল নেভিতে নেভাল ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে ভারতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন। গণপূর্ত বিভাগের অধীনে প্রথম তিনি নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, পরে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় বিলাম-পিন্ডি স্টেট রেলওয়েতে বদলি হন। অতঃপর ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে পদোন্নতি পান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়েতে। তিনি পর্যায়ক্রমে একই পদে নিজামের স্টেট রেলওয়েতে যোগ দেন। প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এবং রেললাইন স্থাপনের জন্য জরিপ ও নির্মাণের সময় এ বিষয়ে লেখা তাঁর একটি সচিত্র ডায়েরি পাওয়া যায়। উক্ত ডায়েরিতে তিনি ঢাকার আশপাশের অঞ্চলের বেশ কিছু স্কেচ করেন; জলরঙে কিছু ছবিও আঁকেন তাঁর ডায়েরিতে। ‘ওয়াটার ওয়ার্কস’, ‘ফুলবাড়িয়া’, ‘মিরপুর’, ‘সাভার’, ‘টঙ্গী ব্রিজের’ চিত্রও এঁকেছিলেন তিনি।<sup>২১</sup>



## চার্লস পোট

ঢাকার বিখ্যাত আর্মেনীয় গির্জা ও পোগোজ স্কুলের সঙ্গে ঢাকায় আসা যে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর নাম জড়িত তিনি হলেন চার্লস পোট। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ইউরেশিয়ান পোটের বাবা ছিলেন এডওয়ার্ড পোট। চার্লস পোট ছিলেন পাটনার অধিবাসী। পড়াশোনা করেছিলেন কলকাতায়। লন্ডনে খোদাইকারী হিসেবে কাজও করেছেন। আরো জানা যায় যে, চার্লস পোট ছিলেন চিরকুমার। আর্মেনীয় গির্জার ভেতরের বেদিতে এখনো দুটি তেলরঙের-চিত্র রয়েছে। ১৮৪৯ সালে চার্লস পোট তেলরঙে ত্রুশবিদ্ধ যিশু ও লাস্ট সাপারের দুটি ছবি আঁকেছিলেন। ঢাকার পোগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জিএন পোগোজের একটি প্রতিকৃতি স্কুলের অফিসকক্ষে শোভা পাচ্ছে। কারও কারও মতে, প্রতিকৃতিটি চার্লস পোটের আঁকা।<sup>২২</sup> তিনি ইস্ট ইন্ডিয়ানস পিটিশন কমিটির সদস্য ছিলেন।<sup>২৩</sup>

## রবার্ট দিউ (উনিশ শতক)

অপর একজন ইংরেজ শিল্পী ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলায় এসেছিলেন। তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ান আইজাক টয়েনবি রবার দিউ। এদেশে আসা অনেক শিল্পীর মতই ছিলেন একজন সিভিলিয়ান। ১৮০১ সালে সহকারী এবং ১৮৩৫ সালে জেলার ভারপ্রাপ্ত জর্জ ছিলেন। এই জেলার কিছু মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র অঙ্কন করেন রবার দিউ যেগুলো ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে আজও সংরক্ষিত। এই ছবিগুলো এক মহামূল্যবান সম্পদ।<sup>২৪</sup>

## আলম মুসাব্বির (উনিশ শতক)

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ঢাকার নিমতলী প্রাসাদের নায়েব নাজিম নুসরত জং(১৭৮৬-১৮২২খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আলম মুসাব্বির নামে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর শিষ্যদের সমভিব্যাহার ঢাকার প্রসিদ্ধ ঈদ ও মহররম মিছিল এর ওপর ৩৯টি চিত্ররাজি অঙ্কন করেন। সর্বমোট উনচল্লিশ চিত্ররাজির মধ্যে ২২টি ঈদ মিছিল এবং ১৭টি মহররম মিছিলের চিত্র। তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর জে. টি র্যাংকিন এসব চিত্রকে জলরঙে আঁকা হয়েছিল বলে মনে করেন।<sup>২৫</sup>

‘আলম মুসাব্বির’ সম্ভবত একজন অবাঙালি ছিলেন। ‘মুসাব্বির’ শব্দের অর্থ শিল্পী এবং ‘আলম মুসাব্বির’ অর্থ বিশ্বের শিল্পী। আলম মুসাব্বিরের চিত্রকর্মে তাঁর নামের স্বাক্ষর ফার্সিতে লেখা এবং তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।”<sup>২৬</sup>

আলম মুসাব্বিরের ঈদ ও মহররম মিছিল এর চিত্ররাজি নওয়াব শায়েস্তা খানের পরিবারের সংগ্রহে ছিল। ঢাকার বিশেষজ্ঞ এস. এম তৈফুর জানিয়েছেন, মহররম উপলক্ষে বেচারাম দেউরীর দেয়ালে সংশ্লিষ্ট চিত্রাবলি ঝুলিয়ে রাখা হত প্রদর্শনের জন্য। এগুলো পরে খান সাহেব মৌলভী আবুল হাসনাত আহমদ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে প্রদান করেন।

আলম মুসাব্বির ও তার শিষ্যরা হাতে-তৈরী কাগজের উপর অঙ্কনের কাজ করতেন। এ কাগজগুলি আকারে ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি। এসব চিত্রকর্মে মুঘল-ইউরোপীয় শৈলীর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এবং কোম্পানি স্কুলের চিত্রশিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এসব চিত্রধারার মূল বৈশিষ্ট্য হল স্বচ্ছ রং ব্যবহার করা। তিনি তাঁর চিত্রকর্মে দেশীয় রংবিন্যাস প্রয়োগ করেছেন এবং সেখানে ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত(European Perspective) কিছু লক্ষণ দেখা যায়। আলম মুসাব্বিরের রঙিন চিত্রাঙ্কনগুলি ঢাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দলিল।<sup>২৭</sup>

আলোচ্য এসকল চিত্রশিল্পী ছাড়াও দু’একজন অনামা শিল্পী ঢাকা বিষয়ে চিত্র এঁকেছেন। তবে তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্য না জানা থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর হয়নি কিন্তু তাদের আঁকা চিত্রসম্ভারের বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়েছে এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে।

তথ্য নির্দেশ:

১. M. Archer, 'British Painters of the Indian Scene', in *Hiren Chakerbarti (ed.) European Artists and India, 1700-1900*, Calcutta, 1987, p. 1
২. স্যার চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, ভাবান্তর-শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম, হায়াৎ মামুদ (সম্পা:), ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ২৬
৩. *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ২৬
৪. শামীম আমিনুর রহমান, *শিল্পীর চোখে ঢাকা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১১
৫. প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা: অমল গুপ্ত অয়ন, ১৯৭৮, পৃ. ৫৪-৫৯
৬. স্যার চার্লস ড'য়লী, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ২০
৭. প্রদ্যোৎ গুহ, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৫৮-৫৯
৮. শামীম আমিনুর রহমান, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ২১
৯. *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ২২
১০. প্রদ্যোৎ গুহ, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৪১
১১. *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৪৬
১২. শামীম আমিনুর রহমান, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১৮
১৩. *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১৯
১৪. প্রদ্যোৎ গুহ, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৪৭
১৫. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা:), *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১০০
১৬. শামীম আমিনুর রহমান, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৩০
১৭. *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১৮
১৮. *প্রাণ্ডজ*,
১৯. <http://collections.vam.ac.uk/item/0105737/painting-a-ruined-gateway-at-dacca/>
২০. [http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/other/019wdz\\_0000\\_04163\\_U00016000.html](http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/other/019wdz_0000_04163_U00016000.html)

২১. ICE (*Institution of Civil Engineers*) *Proceedings*, Vol- 3, Issue -4, p.p. 496-497
২২. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী - ১ম খণ্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০, পৃ.১৬১
২৩. Poor relations: *The Making of Eurasian Community in British India, 1773-1833*, Christopher J Hawes, Curzon press: Richmond Surrey, 1996.
২৪. সৈয়দ লুৎফুল হক, *হাজার বছরে: ঢাকার চিত্রকলা ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১২, পৃ. 88
২৫. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ১৫
২৬. সৈয়দ লুৎফুল হক, *প্রাণ্ডু*, পৃ.৩৮
২৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদনা:), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড -১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২৭৭

## তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকায় কোম্পানি আমলের চিত্রের বিষয়বস্তু

## তৃতীয় অধ্যায়

### ঢাকায় কোম্পানি আমলের চিত্রের বিষয়বস্তু

কোম্পানি আমলে ঢাকায় বেশ কয়েকজন বিদেশি চিত্রকর এসেছিলেন, তারা এবং এ দেশিয়(স্থানীয়) চিত্রকরেরা ঢাকাকে কেন্দ্র করে নানা বিষয়ে বেশকিছু চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন, এ সকল চিত্রকরদের সমক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, আলোচ্য অধ্যায়ে এই সকল চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকর্মের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল। কোম্পানি আমলে ঢাকা বিষয়ক চিত্রকর্ম অঙ্কনে যারা স্মৃতির পাতায় নাম রেখে গেছেন তারা হলেন চার্লস ড'য়লি, জর্জ চিনারী, রবার্ট হোম, ফ্রানসেসকো রেনাস্টি, আর্থার লয়েড ক্রে, জোসেফ স্কট ফিলিপস, হেনরি ব্রিজিজ মোলসওয়ার্থ, ফ্রেডেরিক আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক, দেশি শিল্পী আলম মুসাব্বির এবং কতিপয় অনামা শিল্পী। কোম্পানি আমলে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলেন চিত্রশিল্পী চার্লস ড'য়লি। তাঁর এবং উপরে উল্লেখিত অপরাপর কোম্পানি আমলের শিল্পীদের চিত্রকর্মের বিবরণ নিম্নে আলোচিত হল।

#### চিত্র নং - ০১: লালবাগ কেল্লার প্রাচীর

বাংলাদেশে মুঘল প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে বিদ্যমান একমাত্র নিদর্শন লালবাগ দুর্গ। ঢাকায় মুঘল শাসনামলে দুর্গটি 'কেল্লা-ই-আওরঙ্গবাদ' নামে পরিচিত ছিল। যুবরাজ আযম ঢাকার সুবাদার থাকাকালীন সময়ে ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন।' কিন্তু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই আওরঙ্গজেব তাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। তাঁর যাওয়ার পর ঢাকায় আসেন শায়েস্তা খান। তিনি ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করলেও দুর্গের কাজ সমাপ্ত করেননি। কারণ ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের কন্যা বিবি পরী এখানে মারা গেলে দুর্গটিকে তিনি অপয়া হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলে দুর্গের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। উইলিয়াম হজেস যখন ১৭৮৯ সালে ঢাকায় এসেছিলেন তখন তাঁর ডায়েরির লেখা থেকে জানা যায় যে, লালবাগ প্রাসাদ দুর্গটি একসময় কোম্পানির সৈন্যদের ব্যারাক ও কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার যখন ঢাকা ভ্রমণে আসেন তখন তিনি লালবাগ দুর্গটিকে লতাগুল্মাচ্ছাদিত এবং ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দেখতে পান। ১৮৪৪ সালে স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসন এই দুর্গের স্থায়ী লিজ পায় এবং একে

ঢাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে। দুর্গটি ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের সময়ে একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।<sup>২</sup> তবে বর্তমানে লালবাগ দুর্গটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আন্তর্ভাষীন।

দুর্গটি বুড়িগঙ্গার উত্তর পাড়ে পুরনো ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গটিকে এর প্রধান তিনটি ভবন (মসজিদ, বিবি পরীর সমাধিসৌধ এবং দিউয়ান-ই-আম), দুটি প্রবেশপথ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত একটি দুর্গ প্রাচীরের অংশের সমন্বয়ে মুঘল আমলের একটি দুর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে ১৮ একর বিস্তৃত দুর্গ এলাকায় বনন কাজের ফলে ২৬/২৭টি কাঠামোর অস্তিত্বসহ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পয়োষ্কাশন ব্যবস্থা, ছাদ-বাগান ও ঝর্ণার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক সংস্কারের ফলে লালবাগ দুর্গটি বর্তমানে ঢাকাবাসীদের কাছে একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

#### চিত্র নং-১



চিত্র নং-১: লালবাগ কেল্লার প্রাচীর, উৎস: অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

লালবাগ কেল্লার প্রাচীর চিত্রটি ১৮১৬ সালে চার্লস ড'য়লি তাঁর অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। চিত্রটি ছাপচিত্র এবং এক রঙ। ছবিতে লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ অংশ যা বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে তা প্রধানভাবে ফুটে ওঠেছে। চিত্রটি ধূসর রঙে আঁকা। ছবিতে

দেখা যাচ্ছে কেবলটি আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেয়ালে প্লাস্টার খসে পড়েছে। সামনে একটি ঘাটলা। ডানপাশে কেবল প্রাচীরে কয়েকজন লোক বসে আছে। কেবল ডানপাশে কার্নিশের মতো অংশ হতে একজন রমনী নদীর দিকে নেমে আসছে। নদীর ডানপাশে উঁচু একটি অংশে একটি গরু আয়েশিভসিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। কেবল ও স্থাপনাগুলির উপরের অংশ লতাগুলোচ্ছন্ন। শিল্পী ড'য়লি এ দৃশ্যে ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করে চিত্রটিকে বাস্তবতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রটি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

### চিত্র নং- ২: খোলাই খালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর

খোলাই খাল পুরানো ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক-আবাসিক এলাকা। পূর্বের খোলাই খাল ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলে খোলাই নদী হিসেবে প্রবাহিত যা খাল নামে পরিচিত ছিল।<sup>৩</sup> পূর্বে খোলাই খাল শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গ, আহসান মঞ্জিল, বড় কাটরা এবং ছোট কাটরা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এর চারপাশে গড়ে ওঠে। এ এলাকাতে বাস করতেন অনেক বড় ব্যবসায়ী, নবাব পরিবার ও শহরের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ।<sup>৪</sup> ঢাকার প্রথম মুঘল সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক ১৬০৮-১৬১০ খ্রিস্টাব্দে জনগনের স্বাস্থ্য, চলাচল প্রভৃতির সুবিধার জন্য খননকৃত একটি খালের নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ করা হয়।<sup>৫</sup> খালটি শহরকে সুরক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খনন করা হয়। মুঘল আমলে খোলাই খালের উপর নারিন্দা পুল, আমির খাঁ পুল, মেশভির পুল, শ্রীচর পুল, বাবু বাজারের পুল, নাজিরা বাজারের পুল, চানখাঁর পুলসহ দশটি অতি মনোরম পুল নির্মিত হয়েছিল।<sup>৬</sup> একদা বালু নদীর ঢাল হিসেবে চিহ্নিত এ খালটি ফরাসগঞ্জ (ফ্রেঞ্চগঞ্জ) ও গেন্ডারিয়াকে বিভক্ত করে। খালটি ডেমরার কাছে নদী থেকে পৃথক হয় এবং ঢাকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মিল ব্যারাকের কাছে বুড়িগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। বালু নদী থেকে আরম্ভ হয়ে খালটি দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং অপরটি বর্তমানে শাহবাগ এলাকার পশ্চিমমুখী হয়ে ডানে শহরের মধ্য দিয়ে ঢাকা-তেজগাঁও এলাকা অতিক্রম করে।

১৮৩২ সালে মি. ওয়াস্টার নামে ঢাকার একজন কালেক্টর নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের সুবিধার্থে খালটির উপর একক স্প্যানের একটি ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। “এটি ছিল সে সময়ের স্থাপত্যকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ও সাফল্য।”<sup>৬</sup> ইংরেজ আমলে ১৮৬৪ সালে



গর্ভমেন্টের ব্যয়ে খালটি পুনরায় সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। এ খাল দিয়ে শহরে মাল আনা-নেয়ার ব্যাপারে ময়মনসিংহবাসীদের বেশী সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।<sup>১</sup> ধোলাই খাল দীর্ঘদিন সাঁতার, নৌকাবাইচ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার একটি আদর্শ স্থান ছিল। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে খালের দুই তীরে নানাধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হতো।

### চিত্র নং-২



ধোলাই খালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর, ১ সেপ্টেম্বর ১৮২৬, চার্লস ড'য়লি, অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

### চিত্র নং- ২: ধোলাই খালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর ,উৎস: অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

ধোলাই খালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর চিত্রটি ১৮২৬ সালে চার্লস ড'য়লি তার অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। চিত্রটি ছাপচিত্র এবং এক রঙা ছবি। সামনে বুড়িগঙ্গা নদী। নদীর তীরে দেখা যাচ্ছে গাছ দ্বারা আবৃত বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসস্তুপ। ডানপাশে একটি নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, পাশে চারজন লোক গোসল করছে। পেছনে বুড়িগঙ্গার পাড়ে ঢাকা নগরীর দৃশ্য অসাধারণ স্থাপত্য নমুনার সজ্জিত। ইমারতের ছায়া নদীটিকে এক স্বপ্নরাজ্যের ছায়ার আদল এনে দিয়েছে। নদীতে কিছু পাল তোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। মেঘ, পানি ও ইমারতের অপূর্ব সমন্বয়ে চিত্রটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

## চিত্র নং: ০৩: পাগলার পুল

পাগলার পুল মুঘল স্থাপত্যের একটি ধ্বংসাবশেষ যা ঢাকার ৪.৫ কিলোমিটার পূর্বে পাগলার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় বাংলার সুবেদার মীর জুমলার আমলে পুলটি শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা নদীর সংযোগ স্থল ধোলাই নদীর উপর নির্মিত হয়। জানা যায় যে, মীর জুমলা তাঁর আসাম অভিযানের সময় পুলটি নির্মাণ করেন।<sup>৮</sup> ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক টেভারনিয়ার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত নদীর উপর 'মীর জুমলা কর্তৃক নির্মাণের নির্দেশ-প্রাপ্ত ইটের একটি সুন্দর সেতু' লক্ষ করেন। ১৮২৪ সালে ঢাকা সফরকালে, বিশপ হেবার স্থানীয় মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, সেতুটি জনৈক ফরাসি নির্মাণ করেন এবং তিনি সেতুটিকে ধ্বংসপ্রায় দেখতে পান।<sup>৯</sup> তবে উপর্যুক্ত তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ মীর জুমলা বহু পূর্বেই এটা নির্মাণ করেছিলেন এবং এর সূচাগ্র খিলানকে টিউডর গথিক শৈলীরও অংশ বলা যায় না। স্থানীয় লোকদের তৎকালীন বর্ণনা অনুযায়ী পাগলার সেতু যে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ছিল তা এরূপ: সেতুটি চতুর্কেন্দ্রিক পাঁচটি খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল, তবে এর মধ্যে দুইপ্রান্তের দুইটি খিলান ছিল বদ্ধখিলান। সেতুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর চার কোণে স্থাপিত চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ। গম্বুজে আবৃত এই বুরুজগুলোর ভেতরে প্রবেশের জন্য খিলানকার প্রবেশপথ ছিল। এ ধরনের স্থাপত্যশৈলীর খিলান তথা পুরো স্থাপনাটি মুঘল আমলের সর্বত্র দেখা যায়।

## চিত্র নং-৩



চিত্র নং: ০৩: পাগলার পুল, উৎস: অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

পাণ্ডার পুল চিত্রটি ১৮১৭ সালে চার্লস ড'য়লি তাঁর অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। চিত্রটি ছাপচিত্র, এক রজা ছবি এবং ধূসর রঙে আঁকা। চিত্রটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। চিত্রে পুলটিকে দেখা যায় ভঙ্গুর অবস্থায়, পুলটির উপরের অংশ বিভিন্ন লতাগুলো আচ্ছাদিত। পাশে পুলের ধ্বংসাবশেষ। সামনের অংশে একটি নৌকায় কয়েকজন মানুষ কী যেন দেখাচ্ছে এবং কথা বলছে। চিত্রে আরো দেখা যায় অদূরে ইউরোপীয় বাসিন্দাদের সাদা প্লাস্টার আচ্ছাদিত দালানকোঠা যা শিল্পীর আলো ছায়ার পরিস্ফুটনের দক্ষতায় দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

#### চিত্র নং- ০৪: চক ও হোসেনি দালান

প্রাচীন ঢাকার অন্যতম বাজার ছিল 'চক'। মুর্শিদকুলী খান প্রায় ২০০ গজ আয়তনের এই চৌকোনা বাজারটি স্থাপন করেছিলেন। "সেই সময়ে নগরীর এই অঞ্চলটাকে বলা হতো পুরানা নেকাউস! 'নেকাউস' বা 'নাখাস' শব্দের অর্থ হলো দাস। অর্থাৎ মুঘল আমলে এই "চক", দাস বিক্রীর কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিল।"<sup>১০</sup>

জেমস টেলর তৎকালীন চকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চক বা বাজার এলাকা শহরের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত ছিল। এটা বেশ বড় আকারের বর্গাকৃতি স্থান এবং যার আশে পাশে মসজিদ ও দোকানপাট দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। যে উন্মুক্ত স্থানে চকের বাজার বসত, তার চতুর্দিক নীচু দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চতুর্পার্শ্বে গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা আছে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি ভারী কামান স্থাপিত। যেটি 'মরিয়ম' নামে পরিচিত ছিল।<sup>১১</sup> বর্তমানে চকবাজারের আশে পাশে অবস্থিত রয়েছে ঢাকার বহু বিখ্যাত স্থাপনা। যেমন: শাহি মসজিদ (শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত), বড় কাটরা, ছোট কাটরা প্রভৃতি।

কোম্পানি আমলে চকের সাথেই ছিল হোসেনি দালান। ১৬৭৬ সালে নির্মিত এই দালান ছিল সেই সময়ের পুরাতন ঢাকার নবাবদের প্রধান নামাজ আদায়ে স্থান ও ধর্মীয় ইমারত। উপযুক্ত নবাবেরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের।

হোসেনি দালান পুরানো ঢাকায় অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি ইমারত। ঢাকায় শাহ সুজার (১৬৩৯ খ্রি.) সুবাদারির সময় মীর মুরাদ নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তাঁর নির্মিত ইমারতের অন্যতম ঢাকার হোসেনি দালান বা ইমামবাড়া (হযরত ইমাম হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত)।<sup>১২</sup>

৬১ হিজরির ১০ মুহররম (৬৮০ সালে ১০ অক্টোবর নির্মাণ) তারিখে ইরাকের কারবালার যুদ্ধে ইমাম-হোসেনের শাহাদত বরণ স্মরণ করার জন্য এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ইমারতের নির্মাণের পিছনে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, সৈয়দ মুরাদ একদা স্বপ্নে আল হোসেনকে একটি 'তাজিয়াখানা' নির্মাণ করতে দেখে এই ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত হন। তিনিই এই ইমারতের নাম রাখেন 'হোসেনী দালান'।<sup>১০</sup> ভবনটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে শিলালিপিতে লিখিত নির্মাণ-সন থেকে। শিলালিপি অনুযায়ী ১০৫২ হিজরিতে নির্মিত হয় ইমারতটি। পূর্বে ইমারতটি একটি ছোট স্থাপনা ছিল। পরবর্তীকালে এটি বিভিন্ন সময়ে সংস্কার ও সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানরূপ ধারণ করেছে। এই হোসেনি দালান একটি উঁচু মঞ্চের উপর স্থাপিত। পূর্বদিকের একটি সিঁড়ির সাহায্যে এই মঞ্চ উঠতে হয়। মূল ইমারতটি পাশাপাশি সংস্থাপিত দুইটি হলকক্ষ নিয়ে গঠিত। দক্ষিণমুখী 'শিরনি' হলটি ইমাম হোসেনের মৃত্যুর জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কালো রং করা, কারণ কালো রং হচ্ছে শোকের প্রতীক। অন্যদিকে উত্তরমুখী 'খুতবা' হলে রয়েছে সাত ধাপবিশিষ্ট একটি কাঠের তৈরি মিন্বর। শেবোক্ত হলটিতে শিয়াদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই ভবনে আশুরার সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়।

#### চিত্র নং-৪



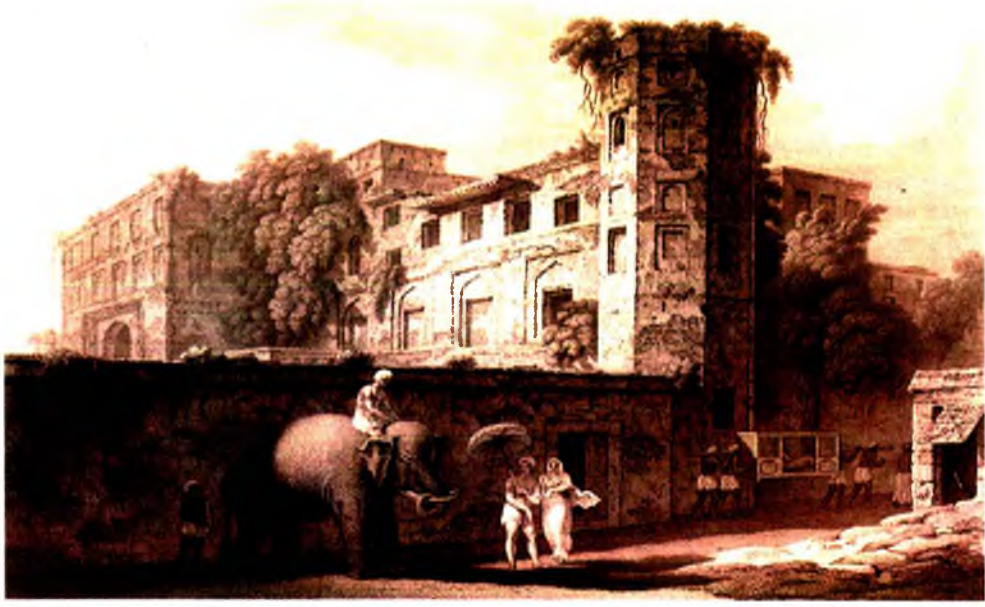
চিত্র নং- ০৪: চক ও হোসেনি দালানে, উৎস- অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

চক ও হোসনি দালান বিষয়ক চিত্রটি ১৮২৭ সালে চার্লস ড'য়লি তাঁর 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা' নামক অ্যালবামে অঙ্কন করেছেন। এটি একটি ছাপচিত্র এবং এক রঙা ছবি। অপরূপ স্থাপত্য নকশায় হোসনী দালানকে দেখা যায়, পাশে আরেকটি মসজিদ লক্ষ করা যায়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে নানা শ্রেণির বণিকেরা গবাদি পশু ও হাতির পিঠে করে পণ্য-সামগ্রী ঢাকার চক বাজারে নিয়ে আসত। চিত্রটিতে একটি গতিময়তা লক্ষ করা যায়। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ইমারতের সামনে মাছতসহ দুটি হাতি, সামনে দুটি গরু গুয়ে আছে, পেছনে চাঁটাইয়ের কয়েকটি বেড়া। গরুর ডানপাশে দু'জন ব্যক্তি কথোপকথনে ব্যস্ত। আর চার-পাঁচ জন ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিমায় কী যেন করছে দেখা যায়। চিত্রটিতে আরো দেখা যাচ্ছে দুটি নারিকেল গাছ। এতে ধূসর রং ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপত্যশৈলীতে ফুটে ওঠেছে হোসেনি দালানের গম্বুজ, শিখরচূড়া, মার্শন নকশা, খিলান আকারের প্রবেশপথ প্রভৃতি। চিত্রটিতে আকাশে পরিপ্রেক্ষিতের সুন্দর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আলো-ছায়ার কম্পোজিশনটি অত্যন্ত সুন্দর।

#### চিত্র নং - ০৫: বড় কাটরা

চক বাজারের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে বড় কাটরা নির্মাণ করা হয়েছিল। বড় কাটরা প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুবেদার শাহ সুজার দেওয়ান আবুল কাশিম ১৬৪৪ খ্রি. শাহ সুজার আবাসনের উদ্দেশ্যে অট্টালিকাটি তৈরি করেন।<sup>১৪</sup> “পূর্ব-পশ্চিমে ২২৩ ফুট লম্বা, এ অংশের মাঝামাঝি তিনতলা উঁচু ফটক, ফটকের পাশে ছিল দোতলা ঘরের সারি, একেবারে দু'প্রান্তে আটকোনা দু'টি বুরুজ, চুনসুড়কি দিয়ে মজুবত করে নির্মিত হয়েছিল অট্টালিকাটি ”।<sup>১৫</sup> এটির নির্মাণে পারসিক 'ক্যারাভান সরাই' অর্থাৎ সরাইখানার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বড় কাটরার উল্লুঙ্গ প্রাঙ্গণ ও তৎসংলগ্ন ছিল অনেকগুলি ছোট কক্ষ এবং এর ভূমি-নকশা ও গঠনের সঙ্গে সম্রাট আকবরের ফতেপুর সিক্রির সরাইখানার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।<sup>১৬</sup> মুঘল যুগের ঢাকার এই ইমারতটি কালের করালগ্রাসে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখনও এটিকে ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

## চিত্র নং-৫



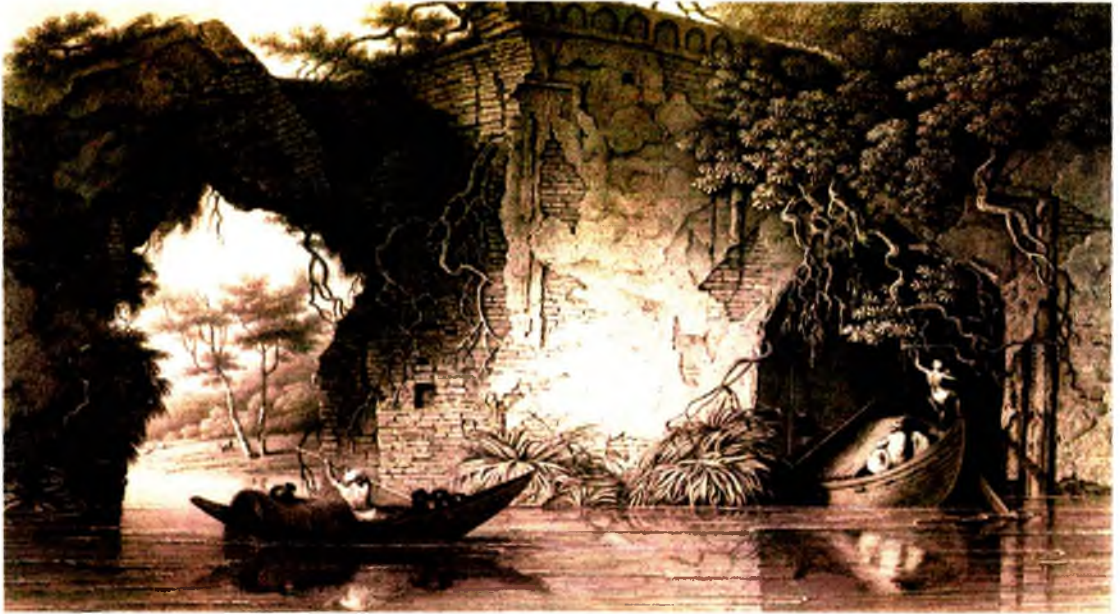
চিত্র নং - ০৫: বড় কাটরা, উৎস-অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

বড় কাটরা ১৮২৩ সালে চালস ড'য়লি তাঁর 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা' নামক অ্যালবামে অঙ্কন করেছেন। এটি ছাপচিত্র এবং এক রঙা ছবি। চালস ড'য়লির আঁকা বড় কাটরা, ত্রিভল বিশিষ্ট ইমারত। বেদির নিচে আরো একটি তলা, পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তবিক। উপর্যুক্ত চিত্রটিতে বড় কাটরাকে ভাল অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যদিও কিছু প্লাস্টার খসে পড়েছে। বড় কাটরার বিশাল বুরুজটি চোখে পড়ার মত। বড় কাটরার গেটের সামনে কয়েকজন বেহারা একটি পালকি করে একজন রমণীকে নিয়ে যাচ্ছে। আরেক দিকে একজন বেহারা ছাতা হাতে নিয়ে একজন রমণীকে হাতের পিঠে তুলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটি হাতের পিঠে দেখা যাচ্ছে একজন আরোহী। এতে ধূসর রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপত্য শৈলীতে ফুটে ওঠেছে বুরুজ, বন্ধ খিলানের ব্যবহার, মিহরাব প্রভৃতি। স্থাপনার কোন কোন জায়গায় আগাছা জন্মে তাতে শিকড় গজিয়েছে। এই চিত্রটিতে ড'য়লি অপরূপ আলোছায়ার বিন্যাস ঘটিয়েছেন। আকাশে মেঘের ব্যবহার ইউরোপীয় পদ্ধতির। মনে হয় যেন ইউরোপীয় রেনেসাঁস আমলের একটি চিত্রকর্ম।

চিত্র নং - ০৬: টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ

টঙ্গী সেতুটি তুরাগ নদীর ওপরে মুঘল আমলে তৈরি একটি স্থাপনা। মীর জুমলা সামরিক প্রয়োজনে এই পুলটি নির্মাণ করেন।<sup>১৭</sup> অন্যমতে, সাটিঙ্গি বা শাহটঙ্গি নামক জনৈক ফকির সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সময়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। টঙ্গীর পুলটি নির্মাণ করা হয় সামারক বাহিনীর চলাচলের সুবিধার্থে। পুলটির গঠন ও নির্মাণশৈলী মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত পাগলার পুলের অনুরূপ বলে। “ঢাকার জয়েন্ট কালেক্টর এ. এল. ক্রে ১৮৬৪ সালে এই নদীর উপর তিন স্প্যানবিশিষ্ট একটি প্রাচীন সেতুর উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন এর নির্মাণকারী মুসলমানরা”<sup>১৮</sup> ঢাকার ইতিহাসবিদ যতীন্দ্রমোহন রায় তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন- ১৮৯০ সালে বন্যার স্রোতে পুলটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখন যে টঙ্গীর সেতু তা পুরাতন জায়গায়ই নতুন ভাবে নির্মিত।

চিত্র নং-৬



চিত্র নং -০৬: টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ, উৎস- অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ চিত্রটি ১৮২৫ সালে চালস ড'য়লি তাঁর 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা নামক অ্যালবামে' এঁকেছেন। এটি ছাপচিত্র এবং এক রঙা ছবি। ধূসর রঙে আঁকা চিত্রটিতে রঙের ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার। চিত্রে সেতুটি দেখা যাচ্ছে ভগ্ন অবস্থায়, প্লাস্টার ঘসে পড়েছে। ইমারতের দেয়ালে আগাছা জন্মেছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া শিকড় দেখা যাচ্ছে। চিত্রটিতে আলো

ছায়ার এক অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। নদীতে দুইটি মহাজনী নৌকায় মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন মাঝি, সেতুটিকে পারাপারের সময় একজন মাঝিকে দেয়ালে জন্মানো শিকড় সরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে। স্থাপত্যশৈলীতে ইওয়ান আকারের প্রবেশপথ, ছাদে মার্লন নকশার ব্যবহার দেখা যায়।

চার্লস ড'য়লির পর সবচেয়ে পরিচিত চিত্র শিল্পী যিনি ঢাকার চিত্রকলা বিষয়ে অঙ্কনে নাম রেখেছেন তিনি হলেন জর্জ চিনারী। নিম্নে তাঁর চিত্রকর্মগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল :

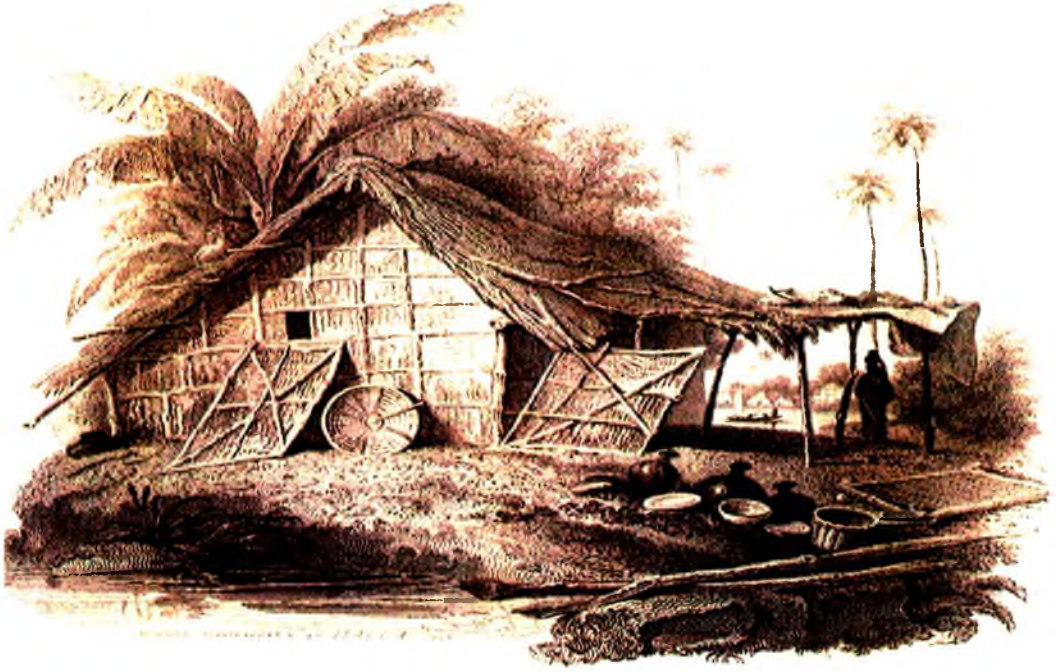
### চিত্র নং - ০৭: ঢাকার আধুনিক বাসস্থান

১৬১০ সালে 'ঢাকা' মুঘল রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভের পর এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মুঘলদের লাখেরাজ সম্পত্তির দানের ফলে ঢাকায় লোকজন বসতি স্থাপন করে এবং ঢাকা শহর হিসেবে গড়ে ওঠে।<sup>১৯</sup> মুঘল এবং কোম্পানি আমলে ঢাকার অধিকাংশ বসতি স্থাপিত হয় নদীর তীর জুড়ে পুরানো ঢাকায়। আর নদীর তীরবর্তী স্থানগুলোতে সাধারণ মানুষ গড়ে তুলে তাদের আধুনিক বাসস্থান। যে কোন অঞ্চলের জলবায়ুই সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ও তার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। ঢাকার জলবায়ু ও মাটির কারণেই তদানীন্তন সময়ে এখানে বৃহৎ কোন ইমারত নির্মিত হয়নি (দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে)। কারণ এ ধরনের জলবায়ুতে প্রতিরোধক উপাদানের অভাব রয়েছে। “সাধারণ মানুষের বাড়ি তৈরীর উপাদান ছিল খবুই সামান্য খড়, বাঁশ, বেত, ছন বা কাঠ অর্থাৎ হাতের কাছেই যা পাওয়া যেত। উনিশ শতকে ঢাকায়ও সাধারণ মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণের জন্যেই এসব উপাদানই ব্যবহার করতেন। এসব বাড়িঘর সাধারণত টিকতো বছর পনেরো মতো”<sup>২০</sup>

উনিশ শতকের গোড়া থেকে শহরে ইটের তৈরী ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছিল। এগুলোর নির্মাতারা ছিলেন দেশি ও অবাঙালি জমিদার, বিদেশি বণিক, মুঘল শাসকবর্গের কিছু অনুচরদের পরিবারবর্গ, উঠতি হিন্দু পেশাজীবী শ্রেণী এবং এ ধরনের নানাবিধ শ্রেণী পেশার মানুষ। এসব ছাড়া অবশ্য শহরের অধিকাংশ বাড়িঘর ছিল খড়ের কুটির। আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের শুরুতেও ঢাকায় খড়, বাঁশ, নলখাগড়া প্রভৃতি দিয়ে নির্মাণ করা হত এক ধরনের বাড়িঘর যাকে বলা হত 'ঘরকাচি মহল'।<sup>২১</sup>



## চিত্র নং-৭



চিত্র নং - ০৭: ঢাকার আধুনিক বাসস্থান, উৎস- অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

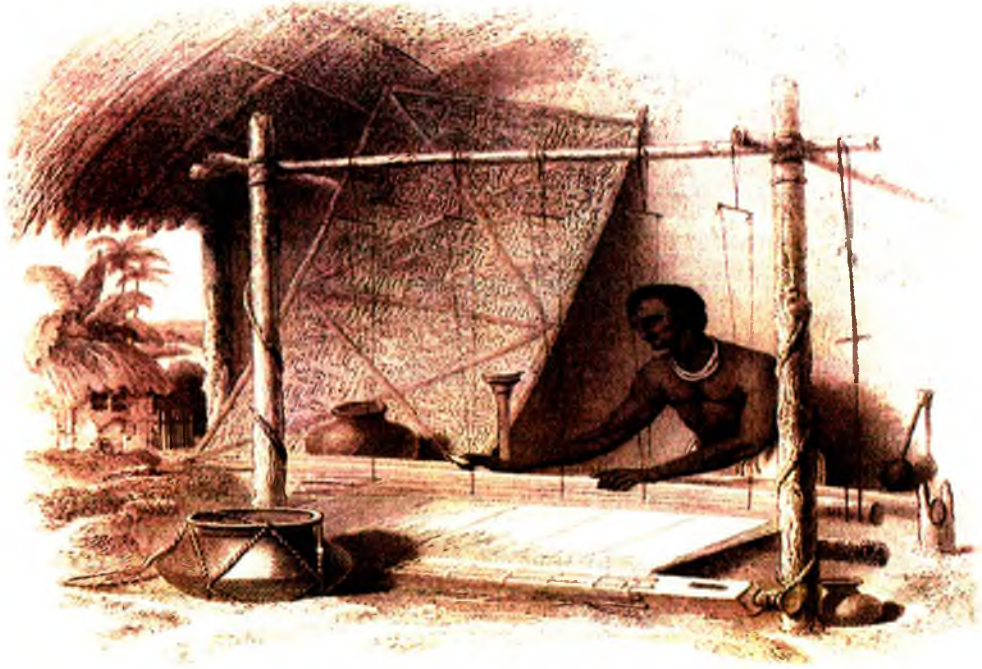
ঢাকার আধুনিক বাসস্থান চিত্রটি ১৮২৩ সালে জর্জ চিনারী যৌথভাবে চার্লস ড'য়লির 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা' নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। এটি ছাপচিত্র এবং এক রঙা ছবি। চিত্রটি ধূসর রঙে আঁকা এবং আনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত। মি. চিনারির রুচিশীল পেনসিলে আঁকা নদীর একাংশের অপর পাড়ে দূরে দু'তিনটি পর্ণকুটির পরিদৃশ্যমান। সম্মুখের কুটিরটি দরিদ্র মুসলিম তাঁতির। বাঁশ, মাটি ও বেড়া দিয়ে তৈরি বিচালিতে ছাওয়া। তার ছাতা এবং রান্নার কিছু তৈজসপত্র ইতস্তত ছড়ানো, আর ডানদিকের কোনায় পুরানো একটি তাঁতের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে। আরো লক্ষ করা যায় একজন মহিলা পানি আনতে মাথায় কলসি নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে।

## চিত্র নং- ০৮: তাঁতি ও মসলিন

দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাপড়ের চাহিদা পূরণের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এরা হলো হাত ও পায়ের সাহায্যে তাঁতযন্ত্র পরিচালনা করে সুতি বস্ত্র তৈরির কারিগর। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁতে কাজ করত। তবে মুসলমান তাঁতির চেয়ে হিন্দু তাঁতির সংখ্যা

অনেক বেশি ছিল।<sup>২২</sup> ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাংলা সুতিবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। সতের শতকে বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য ছিল মিহি স্বচ্ছ সুতিবস্ত্র 'মসলিন'। বাংলায় বস্ত্রশিল্পের সস্তা উপকরণ তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো এবং খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঢাকার মসলিন রোমে সুখ্যাতি ও বিপুল কদর লাভ করেছিল। 'মসলিন' শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন। মসলিন ফার্সি শব্দ নয়, সংস্কৃত বা বাংলা তো নয়ই। হেনরী ইউল এবং এ. সি বার্নেল মনে করেন যে মসলিন শব্দ মসূল নাম থেকে উদ্ভূত।<sup>২৩</sup> অনেক ইউরোপীয় লেখক ঢাকার মসলিনের সুতকাটুনীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে এরূপ সূক্ষ ও মিহি সুতা তৈরী এবং তাও হাত চালিত একটি সামান্য টাকুর সাহায্যে একমাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই সম্ভব।<sup>২৪</sup> স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মসলিন বিভিন্ন রকমের ছিল। এসব মসলিন কাপড় ফার্সি ভাষার বিভিন্ন কাব্যিক নামে পরিচিত ছিল; যেমন- মলমল খাস, তানজীব (তনুশোভা), আব্রোয়ান, বাফত হানা, শবনম, শরবতি, ডোরিয়া, বুটি ইত্যাদি। তাঁতেই যেসব মসলিনের নকশা করা হতো তাকে বলা হতো জামদানি। মসলিনের কিছু বাংলা নামও পাওয়া যায়। যেমন- নয়নসুখ, চিকন, চারকোণা ইত্যাদি।<sup>২৫</sup> এসব মসলিনের দাম নির্ধারিত হত, কোনটি কত সূক্ষ তার ভিত্তিতে। উৎকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরি হতো ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ি, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে এছাড়া যদুনাথ বসাক লেন, লাল চাঁদ মুকিম লেন, তাঁতিবাজার, যোগীনগর, মহাজনপুর এবং টাকারহাট লেনই ছিল মসলিন তৈরির প্রধান কেন্দ্র।<sup>২৬</sup> মসলিনের এই উৎকর্ষ অর্জিত হয় যারা সুতা কাটতেন এবং যারা কাপড় বুনতেন তাদের অপরিসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় আর নৈপুণ্যের গুণ ও দক্ষতায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণের পর দালালদের সাহায্যে মসলিন ক্রয় শুরু করে, তাঁতিদেরকে দাদন প্রদান করার মাধ্যমে তাদের ঋণের জালে বেঁধে ফেলে। তাঁতিদেরকে উৎপাদনের মাধ্যমে কোম্পানি অত্যন্ত কম মূল্যে দালালদের মাধ্যমে মসলিন সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে মসলিন কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসতে থাকে।

## চিত্র নং-৮



চিত্র নং- ০৮: তাঁতি ও মসলিন, উৎস- অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা

তাঁতি অর্থাৎ মসলিন বয়নরত একজন তাঁতি চিত্রটি ১৮২৩ সালে জর্জ চিনারী চার্লস ড'য়লির 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা' নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। চিত্রটি ছাপচিত্র এবং এক রঙ। ধূসর রঙে আঁকা এবং আনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত। চিত্রে একজন তাঁতি একটি ছনের ছাউনিতে বসে মাকু হাতে মসলিন বুনছে। তাঁতি যেখানে বসে কাজ করছে তার পাশে দেখা যায় একটি ছনের দরজা, কিছু তৈজসপত্র এবং একটি হাঁকা। তাঁতির ছনের ছাউনির একটু দূরে আরো একটি ছনের চৌচালা কুঁড়ের ঘর দৃশ্যমান। তাঁতি একজন হিন্দু তার পোশাকে তা প্রকাশ পেয়েছে। যে স্থানটিতে তাঁতি মসলিন বুনতে ব্যস্ত তার সম্মুখে দেখা যাচ্ছে দুইটি পানির পাত্র রাখা যাতে স্থানটিতে আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং বুনন আরো উৎকৃষ্ট হয়। পাশাপাশি মসলিন বয়নরত একজন তাঁতির একটি কর্মব্যস্ত জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

জর্জ চিনারী পর সবচেয়ে পরিচিত চিত্রশিল্পী যিনি ঢাকা বিষয়ে চিত্রকর্ম অঙ্কন করেছেন তিনি হলেন আর্থার লয়েড ক্রে। নিম্নে তার চিত্রকর্মগুলো সহজে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল:

চিত্র নং - ০৯: লালবাগ দুর্গের তোরণ - ১৮৯৩

চিত্রকর - আর্থার লয়েড ক্রে

লালবাগ দুর্গটি কোম্পানি আমলে বেশ পরিচিত একটি স্থাপনা ছিল। ফলে দুর্গটির তোরণ ঢাকা বিষয়ে যে সকল চিত্রকর চিত্রকর্ম অঙ্কন করেছেন, তাঁদের তুলিতে বারবার মূর্ত হয়ে উঠেছে। লালবাগ দুর্গের তোরণটির চিত্র অঙ্কন করেন চার্লস ড'য়লি, আর্থার লয়েড ক্রে, রবার্ট হোম প্রমুখ কয়েকজন। নিম্নে আর্থার লয়েড ক্রে অঙ্কিত লালবাগ দুর্গের তোরণ স্কেচটির বর্ণনা দেওয়া হল:

চিত্র নং-৯



চিত্র নং-০৯: লালবাগ দুর্গের তোরণ - ১৮৯৩, উৎস- লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল

লালবাগ দুর্গের তোরণ স্কেচটি ১৮৯৬ সালে আর্থার লয়েড ক্রে তার 'লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল'-এ অঙ্কন করেছেন। সাদা-কালো রং ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রটিতে সে সময়ের পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় সাহেবকে সালাম জানাচ্ছে গ্রহরী। আরো দেখা যায়

লালবাগ দুর্গের তোরণ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। ছবিতে লালবাগ দুর্গের তোরণ অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠেছে। একটি ঘোড়ার গাড়িকে তোরণের পথ ধরে সামনে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে।

### চিত্র নং - ১০: ঢাকা জেল পরিদর্শন

ক্রে'র আঁকায় ফুটে ওঠেছে ঢাকা জেলের কয়েদিদের চিত্র। ঢাকা জেল যা বর্তমানে পুরানো ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার তথা জেলখানা। এই জেলখানার রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। জানা যায় যে, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোম্পানি আমলে। তারও পূর্বে এখানে ছিল মুঘল দুর্গ, টাকশাল।<sup>২৭</sup> মুঘল আমলে এই দুর্গকে ঘিরেই প্রাদেশিক সুবাদারের আবাস, কার্যালয় ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং অনেক বিখ্যাত স্থাপনাও নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে এখানে ঢাকার নায়েবে-নাজিম বা উপ-নবাবরা বাস করতেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকা দখল করলে দুর্গটি কোম্পানির কর্তব্যক্তিদের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে দুর্গটিকে জেলখানা হিসেবে গড়ে তোলা হয়।<sup>২৮</sup> আর্থার লয়েড ক্রে তাঁর ডায়েরিতে ঢাকা জেল সম্বন্ধে লিখেছেন এভাবে- “ঢাকা জেলার প্রাক্তন সুবিস্তৃত। ৪০০ কয়েদী রাখার ব্যবস্থা আছে। ঢাকা জেল শহরের কেন্দ্রস্থল, চকবাজারের কাছে। জেলের পাশেই পাগলাগারদ। জেলারের মাসিক বেতন ১০০ টাকা। তিনি জেলে তৈরি জিনিসের উপর কমিশন পান। তিনি আরো লিখেন, আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একজন জেলরক্ষক জেলের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করতেন। যিনি প্রায়ই হতেন আর্মেনিয়ান বা ইউরোশিয়ান...”<sup>২৯</sup> কোম্পানি আমল হতে ঢাকা জেলে ইউরোপীয় কয়েদিদের সাথে সাথে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী রাজনৈতিক বন্দিদেরকেও এই কারাগারে রাখা হত এবং হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হত। কেন্দ্রীয় কারাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এতে নিয়োগ দেওয়া হয় একজন জেলা তত্ত্বাবধায়ক।

চিত্র নং-১০



চিত্র নং-১০: ঢাকা জেল পরিদর্শন, উৎস-লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল

ঢাকার জেল পরিদর্শন শীর্ষক চিত্রটি আর্থার লয়েড ক্রে ১৮২৬ সালে তাঁর 'লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল'-এ অঙ্কন করেছেন। চিত্রটি স্কেচ করা এবং সাদা কালো রং -এ আঁকা। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, জেল পরিদর্শনে এসে কালেক্টর ইংরেজবাবু দেশীয় জেলারদের সাথে নিয়ে জেল পরিদর্শন করছে। তাঁরা জেলের কয়েদিদের সাথে কথোপকথন করছে এবং তাদের খোঁজখবর নিচ্ছে যা চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কয়েদিরা কালেক্টরবাবু ও জেলারদের অত্যন্ত সমীহ করছে চিত্রে তা লক্ষণীয়। এই চিত্রে আরো দেখা যাচ্ছে কিভাবে জেলের অন্যান্য কর্মচারীরা কয়েদিদের জন্য খাবার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র নং - ১১: বরাহ নিধন

কোম্পানি আমলে ইংল্যান্ড হতে আগত সিভিলিয়ানদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ দেওয়া হতো। এটি ছিল চাকরির প্রথম ধাপ। আর্থার লয়েড ক্রে ইংল্যান্ড হতে আগত একজন নবীন সিভিলিয়ান ছিলেন। আর চাকুরীর সুবাদে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছেন। ঐতিহাসিক মুন্তাসির মামুন মন্তব্য করেন যে-“ভারতবর্ষের এই সিভিলিয়ানদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল পিগ স্টিকিং বা বরাহ নিধন।”<sup>৩০</sup> এ প্রথা সিভিলিয়ানরা শুরু করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে। এক সূত্র হতে জানা যায় যে, মৌসুমী বৃষ্টির পর টঙ্গীর সমতলভূমিতে তাবু খাটাতেন সিভিলিয়ানরা তারপর তারা যতরকম মাঠ ক্রীড়া আছে তাতে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। বন্য বরাহ শিকার ছিল সবার প্রিয়, তারা তিনহাত লম্বা ভারী একটি বন্দম দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বন্য বরাহ শিকার করত। আর্থার লয়েড ক্রে-র বই ‘সীভজ ফ্রম এ ডায়েরী ইন লোয়ার বেঙ্গল’তে বরাহ নিধনের প্রায় একই বিবরণ পাওয়া যায়।<sup>৩১</sup>

চিত্র নং-১১



চিত্র নং - ১১: বরাহ নিধন, উৎস- লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল

বরাহ নিধন বিষয়ক চিত্রটি ১৮৯৬ সালের দিকে আর্থার লয়েড ক্রে তাঁর 'লিভস ফ্রম আ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল'-এ অঙ্কন করেছেন। চিত্রটি ছাপচিত্র এবং এক রঙ। চিত্রে দেখা যায় সিভিলিয়ানরা একটি সমতল বন্যভূমিতে বরাহ নিধনে মত্ত হয়েছেন। সকলে ঘোড়ায় চড়ে বহনম হাতে বন্য বরাহ তাড়া করছে। চিত্রে আরো লক্ষ করা যায় যে, কোন একজন সিভিলিয়ান একটি বরাহের গায়ে বহনম ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

ঢাকা বিষয়ে চিত্রকর্ম অঙ্কনে আরো একজন চিত্রকর হলেন রবার্ট হোম। নিম্নে ঢাকা বিষয়ে তার একটি চিত্রকর্মের বর্ণনা দেওয়া হল :

চিত্র নং -১২: লালবাগ দুর্গের তোরণ - ১৭৯৯

চিত্রকর - রবার্ট হোম



চিত্র নং -১২: লালবাগ দুর্গের তোরণ - ১৭৯৯, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

রবার্ট হোম ১৭৯৯ সালে চিত্রটি অঙ্কন করেন। চিত্রের পরিমাপ ৬৬.৫ সে.মি. x ৭৭ সে.মি। চিত্রটি তেল রংয়ে আঁকা, আনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত। অনেকগুলো ফিগারের উপস্থিতি নারী, পুরুষ, শিশু। এছাড়া প্রাণীদের সমাগমও এখানে দেখা যায়। চিত্রটিতে একধরনের গতিশীলতা লক্ষণীয়। চিত্রটি ভিক্টোরিয়ান একাডেমিক বাস্তবাদী ধারায় অঙ্কিত। চিত্রে নির্মল সুন্দর আকাশ লক্ষ করা যায়, আকাশ উপস্থাপনে রংয়ের ব্যবহারে টিটেনিয়াম হোয়াইট, আক্টো-মেরিন ব্লু মিশ্রণে পূঞ্জীভূত



মেঘের ইমেজ তৈরি করা হয়েছে। আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে চমৎকার ব্যঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। ১৭৯৯ সালে রবার্ট হোম লালবাগ দুর্গকে বেশ ভালো অবস্থায় দেখেছিলেন। চিত্রে দেখা যায় সন্তানসহ মা, ফলবিক্রেতা, পখিক, উটের পিঠে মানুষ, কুকুর ও ছাগলের উপস্থিতির সমাগম ঘটিয়ে শিল্পী দক্ষ হাতে দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেছেন। চিত্রে দেখা যায় যে, ইমারতে শ্যাওলা ধরেছে এবং লতাগুলো আচ্ছাদিত। তাঁর অঙ্কিত লালবাগ দুর্গের স্থাপত্যশৈলীতে দেখা যায় মিনার, ওরিয়াল উইনডো, কিয়ক প্রভৃতি যা মুঘল স্থাপত্যের পরিচায়ক ও ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রতিনিধিত্ব করছে। সামগ্রিক ছবিতে সবুজ, মেটে ও নীল-সাদা রঙের সমাহার। আলো ও ছায়ার চমৎকার বিন্যাস কম্পোজিশনে। যা চিত্রটিতে ত্রিমাত্রিকতার আভাস ও বাস্তবতা এনেছে।

ঢাকা বিষয়ে চিত্রকর্ম অঙ্কনে আরো যিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি হলেন হেনরি ব্রিজেস মোলসওয়ার্থ।  
নিম্নে তার দু'টি চিত্রকর্মের বর্ণনা দেওয়া হল :

চিত্র নং -১৩: ঢাকার কাছে ফুলবাড়িয়া (সাতার)

মুঘল আমলে মূল ঢাকা শহরের উত্তর সীমান্তে ছিল ফুলবাড়িয়া নামের এক মহল্লা। ১৬৪০ সালে ভ্রমণরত পর্তুগিজ পর্যটক সিবাস্টিয়ান ম্যানরিক ফুলবাড়িয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এই স্থানের নাম মুঘল আমলের সমকালীন দলিল দস্তাবেজও পাওয়া যায়। স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে খুব একটা সঠিক ধারণা না করা গেলেও, এটি বেশ একটি পুরানো এলাকা। ব্রিটিশ আমলে ফুলবাড়িয়ার উত্তরে রমনা এলাকা প্রতিষ্ঠা হলে, ফুলবাড়িয়া এলাকা পুরানো এবং নতুন ঢাকার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে পরিণত হয়।, ফুলবাড়িয়া নামটির উৎস নিয়ে নানা ধরণের মতামত রয়েছে। অনেকের মতে, ঢাকায় যাঁরা আতর তৈরি করতেন, তাঁদের ফুল সরবরাহ করা হতো এ অঞ্চল থেকে। সে থেকে এই এলাকার নাম হয়েছিল ফুলবাড়িয়া। আবার অনেকে বলেন, পুরানো রেল স্টেশনের কাছে ফুলশাহ নামে যার মাজার আছে তার নামকে কেন্দ্র করেই ফুলবাড়িয়া নামের উৎপত্তি।<sup>৩২</sup> এখানেই ঢাকা-ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে লাইনের একটি স্টেশন নির্মাণ করার ফলে ফুলবাড়িয়া খ্যাতি লাভ করে ব্রিটিশ আমলে। এভাবেই ফুলবাড়িয়া ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন নামে খ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৪ সালে এই রেললাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ১৮৮৫ সালে ঢাকা ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ১০.২৫ মাইল দীর্ঘ ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইন

প্রথমবারের মত যাত্রা শুরু করে। এই এলাকা ঘিরে নানা স্থাপনা নির্মিত হয়। ১৯৬৮ সালে ঢাকা রেলস্টেশন স্থান পরিবর্তন করে কমলাপুরে চলে গেলে ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনটি পরিত্যক্ত হয়। এই এলাকার গড়ে ওঠে ঢাকার নগর ভবন এবং ফুলবাড়িয়া স্টেশন রূপান্তরিত হয়েছে বাস টার্মিনালে।<sup>৩৩</sup>

### চিত্র নং-১৩



চিত্র নং-১৩: ঢাকার কাছে ফুলবাড়িয়া (সাভার), উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

ঢাকার কাছে ফুলবাড়িয়া (সাভার) চিত্রটি হেনরি ব্রিজেস মোলসওয়ার্থ জল রংয়ে আঁকেন। চিত্রটি একটি নিসর্গ দৃশ্য। চিত্রটির বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে আকাশ ও বিরাট চারণভূমি। চারণভূমির একপাশে দেখা যাচ্ছে একসারি ছনের চৌচালা ঘর ও গাছপালা। কোন এক ছনের চৌচালা ঘর হতে চুলার ধোঁয়া দিগন্ত জুড়ে মিশে যাচ্ছে। চারণভূমিতে কিছু গবাদি পশুকে চরতে দেখা যায়। মেঘ ও প্রাকৃতিক বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিল্পী অঙ্কন করেছেন। বিভিন্ন রঙের ব্যবহার মাধ্যমে চিত্রকর চিত্রকর্মটিকে প্রশংসনীয় করে তুলেছেন।

## চিত্র নং -১৪ - ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস

‘ওয়াটার ওয়ার্কস’ কথাটির সাথে ঢাকার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা জড়িত রয়েছে। কারণ ওয়াটার ওয়ার্কস থেকেই ঢাকায় প্রথম পরিশ্রুত পানি সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালের আগে ঢাকায় খাবার পানির উৎস ছিল কুয়ো বা নদী। ভিত্তিরা মশকে করে পানি দিয়ে যেতেন ঘরে ঘরে। কিন্তু এই পানি পরিশ্রুত না হওয়ায় ঢাকায় প্রতিনিয়ত মহামারীর লেগে থাকত। ১৮৭১ সালে নবাব আবুল গণি কে. সি. এস আই উপাধি পেলেন। তাই তিনি খুশি হয়ে ঢাকার স্থায়ী কল্যাণে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এ কারণে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি পরিশ্রুত পানি সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করলো কিন্তু নবাব ঢাকাবাসীদের বিনামূল্যে পানি দেওয়ার শর্তে সেই দানের পরিমাণ দিগুণ করে দিলেন। ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মিত হলে তা রক্ষণাবেক্ষণের ও পানি সরবরাহের জন্য পাইপ বসানোর জন্য নবাব আহসানউল্লাহ অর্থায়ন করেছিলেন।<sup>৩৪</sup> এসব কর্মকান্ডের ভিত্তিতে ১৮৭৪ সালে, তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড নথক্রক ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এবং ঢাকার কমিশনার এফ. বি. পিকক তা উদ্বোধন করেন।<sup>৩৫</sup>

## চিত্র নং-১৪



চিত্র নং -১৪ : ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস চিত্রটি হেনরি ব্রিজেস মোলসওয়ার্থ জল রংয়ে আঁকেছেন। চিত্রটিতে ধূসর বাদামী রং এবং আন্ট্রা ব্লু রংয়ের ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রটির অঙ্কনশৈলী অত্যন্ত চমৎকার। এটি ইতিহাসের একটি মাইলফলক। চিত্রে ঢাকার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা কি ধরনের ছিল তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রটিতে স্বচ্ছ সুন্দর আকাশের কাজ লক্ষ করা যায়, যার মাধ্যমে একটি সুন্দর বিকেলের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশে দূরে একটি মঠ ও আরো কিছু স্থাপনা দেখা যায়।

ঢাকাকে নিয়ে ছবি অঙ্কনে আরো যিনি নাম রেখে গেছেন তিনি হলেন ফ্রেডেরিক উইলিয়াম আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক। নিয়ে ঢাকা বিষয়ে তার দু'টি চিত্রকর্মের বর্ণনা দেওয়া হল :

#### চিত্র নং -১৫: ঢাকার ভগ্নপ্রায় (নিমতলী প্রাসাদ) তোরণ

ঢাকায় মুঘল শাসনের শেষদিকে ১৭৬৫-৬৬ সালে নায়েবে-নাজিম অর্থাৎ ঢাকা-নিয়াবত অথবা ঢাকা প্রদেশের 'নিয়াবত' ডেপুটি-গভর্নরের বাসস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নিমতলী প্রাসাদ। যেহেতু এটি ঢাকা নগরের নিমতলী মহল্লায় অবস্থিত ছিল, তাই এটি জনসাধারণ্যে নিমতলী কুঠি অথবা প্রাসাদ নামে পরিচিত লাভ করে। নিমতলী দেউড়ি বাদে প্রাসাদের বাকি অংশ বর্তমানে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।<sup>১৬</sup> প্রাসাদের প্রবেশের জন্য পশ্চিমদিকে যে প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছিল সেটিই এখন নিমতলি দেউড়ি নামে পরিচিত। এটি ঢাকার নিমতলি এলাকায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্ষণের ভিতর অবস্থিত। নগরের উত্তর প্রান্তে বর্তমান নিমতলী মহল্লা এবং হাইকোর্ট ভবনের মাঝখানে এক প্রশস্ত জায়গা জুড়ে নিমতলি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল।<sup>১৭</sup> এ সময় জায়গাটি ঝোঁপঝাড় আর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। নিমতলী প্রাসাদের সঠিক অবস্থানের কোন সমকালীন অঙ্কন অথবা নকশা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্ষণে অবস্থিত বিদ্যমান একমাত্র গেটকে নিমতলী দেউড়ি বিবেচনা করে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এটি মুঘল প্রাসাদগুলোর নকশা অনুসরণ করেই নির্মিত হয়েছিল। নিমতলী প্রাসাদটি নায়েবে-নাজিমের বাসভবন থাকাকালীন সময়ে এটি ঢাকার অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতো এমন একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান ছিল ঈদ শোভাযাত্রা যা ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে বের করা হতো। এটি নিমতলী দেউড়ি থেকে শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে আবার এখানে এসে শেষ হতো। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকা নিমতলি প্রাসাদকে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায়

দেখতে পান এবং তিনি এর একটি ভৌগোলিক বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি যর্থাথই নয়নাভিরাম গেটের (নিমতলী দেউড়ি) কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত নিমতলী দেউড়িটি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির অফিস, সেমিনার হল ও লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। “১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এটিকে সংস্কার করে জাদুঘরে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।”<sup>৩৮</sup> উইলিয়াম আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক-এর আঁকা ঢাকার ভগ্নপ্রায় (নিমতলী প্রাসাদ) তোরণ চিত্রটির বর্ণনা দেবার পূর্বে এর সমন্ধে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল এখানে যে প্রাসাদ তোরণের অঙ্কন করা হয়েছে তা এশিয়াটিক সোসাইটির অবস্থিত নিমতলি দেউড়ি নয়, এটি ছিল মূলত নিমতলি প্রাসাদের প্রাসাদ তোরণ যা এখন বিলুপ্ত।

#### চিত্র নং-১৫



চিত্র নং -১৫: ঢাকার ভগ্নপ্রায় (নিমতলী প্রাসাদ) তোরণ, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

ঢাকার ভগ্নপ্রায় (নিমতলী প্রাসাদ) তোরণ চিত্রটি ১৮৬৩ সালে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক জল রংয়ে আঁকেন। চিত্রটিতে নিমতলী প্রাসাদের প্রাসাদ তোরণ দেখা যাচ্ছে।

তোরণটিকে মোটামুটি ভালো অবস্থায় দেখা যায় যদিও কোন কোন অংশের প্লাস্টার খসে পড়েছে। ইমারতের বেশ কিছু অংশে আগাছা জন্মেছে। তোরণটির ইওয়ান আকারের প্রবেশপথ দিয়ে কিছু লোকজনকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে। আবার কিছু লোকজনকে তোরণের পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্থাপত্যশৈলীতে ফুটে ওঠেছে সরু চূড়া, কিয়স্ক ধরনের মিনার, মিহরাব প্রভৃতি লক্ষণীয়। শিল্পী ফেবেক সাদা মেঘহীন আকাশ জল রং-য়ে ওয়াশ পদ্ধতিতে অঙ্কন করেছেন।

#### চিত্র নং- ১৬: বুড়িগঙ্গা নদী থেকে দেখা ঢাকা

বুড়িগঙ্গা নদীটি ঢাকা শহরের দক্ষিণে এবং পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত জোয়ারভাটা প্রভাবিত একটি নদী। মুঘলরা এই নদীটির জোয়ারভাটার রূপ দেখে বেশ অভিভূত হয়েছিল। নদীটির নামকরণ বুড়িগঙ্গা করার পেছনে লোক কাহিনী রয়েছে। প্রাচীনকালে গঙ্গা নদীর একটি শাখা ধলেশ্বরীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। যা কালক্রমে তার গতিপথ পরিবর্তন করে গঙ্গার সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ধলেশ্বরী নদীর এই বিচ্ছিন্ন শাখাটি বুড়িগঙ্গা নামে পরিচিতি লাভ করে।<sup>৩৯</sup>

#### চিত্র নং-১৬



চিত্র নং- ১৬: বুড়িগঙ্গা নদী থেকে দেখা ঢাকা, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

বুড়িগঙ্গা নদী থেকে দেখা ঢাকা বিবয়ক চিত্রটি ১৮৬১ সালে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক জল রংয়ে আঁকেছিলেন। রঙের ব্যবহারে আর্ট্রো ব্রু মেরিন ব্যবহারে করা হয়েছে। স্বচ্ছ নির্মল আকাশ ওয়াশ করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অনেকগুলো স্থাপনা দেখা যায় গাছগাছালিসহ। নদীতে দেখা যায় বেশ কয়েকটি নৌকা যেমন- ডিসি, কোসা, মহাজনী ও ছোট জাহাজ চলাচল করছে। নদীর পাড়ে বেশ কিছু মানুষের আনাগোনা লক্ষণীয়।

ঢাকাকে নিয়ে চিত্র অঙ্কনে অপর এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন জোসেফ স্কট ফিলিপস। নিম্নে ঢাকা বিষয়ে তার একটি চিত্রকর্মের বর্ণনা দেওয়া হল :

চিত্র নং- ১৭: রমনা কালী মন্দির

রমনা কালী মন্দির ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ দিকে ২.২২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল রমনা কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ভেতর বর্তমান দিঘিটির পাশেই ছিল প্রায় তিনশত বছর পূর্বে নির্মিত এই মন্দিরটি যা 'কালীবাড়ি' নামেও পরিচিত। জানা যায় যে, শংকরাচার্যের অনুগামী দর্শনার্থী সম্প্রদায় এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে ব্রহ্মী নারায়ণের যোশী মঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে ঢাকায় এসে রমনায় প্রথমে একটি আখড়া স্থাপন করেন। পরে (সম্ভবত সতেরো শতকের প্রথম পাদে) এ স্থানেই হরিচরণ গিরি মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন।<sup>৪০</sup> মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না। তবে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে একে আঠার শতকের স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।<sup>৪১</sup> কালীবাড়ী মন্দিরটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তারা মন্দির ও আশ্রমটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা মন্দিরের সেবায়তসহ প্রায় একশত সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ হত্যা করে। এ সময় কালী মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ গিরি।

ঐতিহাসিক সূত্র হতে জানা যায় যে, প্রাচীন আখড়ার পাশে হরিচরণ গিরি কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি বাঙালি হিন্দু স্থাপত্য রীতি বহন করলেও তাতে মুসলিম রীতির প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। মূল মন্দিরটি ছিল দ্বিতল। এর দ্বিতল ছাদের উপর ছিল ১২০ ফুট উঁচু পিরামিড আকৃতির চূড়া। মূল মন্দিরটি চতুষ্কোণাকার, ছাদ উঁচু এবং বাংলার চৌচালা রীতিকে অনুসরণ করে নির্মিত। মন্দিরের কৌণিক আকৃতির চূড়ার নিম্নভাগ ছিল ছত্রি ডিজাইন শোভিত। একে একরত্ন মন্দিরের সঙ্গেও তুলনা করা

যেতে পারে। মন্দির চত্বরে পুরনো ও নতুন বেশ কয়েকটি সমাধি মন্দিরের কাঠামো ছিল। এই চত্বরে ছিল হরিচরণ ও গোপাল গিরির সমাধি।<sup>৪২</sup>

চিত্র নং- ১৭:



চিত্র নং- ১৭: রমনা কালী মন্দির, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

রমনা কালী মন্দির চিত্রটি ১৮৩৩ সালে জোসফ স্কট ফিলিপস জল রংয়ে অঙ্কন করেন। চিত্রে বৃষ্টিস্নাত মন্দির ও শণের কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। জলরংয়ের এই চিত্রটিতে শিল্পী নানাবিদ রং-এর ব্যবহার করেছেন। এতে বিশেষ করে সবুজ রঙের চমৎকার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। চিত্রটিতে মন্দিরের সামনে বিশাল মাঠ দিয়ে বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় একজন ফেরিওয়ালা ও ছাতা নিয়ে একজন পথচারী দ্রুতবেগে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। আকাশে মেঘের কুণ্ডলীকৃত ব্যবহার দেখে মনে হয় ইউরোপীয় স্টাইলে অঙ্কিত। আকাশটাকে ওয়াশ করা হয়েছে। ছবিতে বৃষ্টিস্নাত দিনের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। দূরে মন্দির ও শণের কুঁড়ে ঘর সাথে একটি লাল নিশান বাতাসে উড়তে দেখা যায় এই লাল নিশানটি রমনা কালী মন্দিরটির অবস্থান নির্দেশ করছে। শিল্পী এই বিখ্যাত কালী মন্দিরটি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে অঙ্কন করেন। এতে বর্ষাকালে ঢাকার বৃষ্টি স্নাত প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কন করেছে। এ বাস্তবতা ঔপনিবেশিক আমলের ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতি থেকে গৃহীত। দূর থেকে দেখা যায় বৃষ্টিস্নাত মন্দির এলাকার



বৃক্ষরাজি। মন্দির অঙ্গনের বাইরে রাস্তা ও মাঠে জমা থাকা বৃষ্টির পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথচারীর দৃশ্য নীলাভ ছাই রং ও মন্দির প্রাচীরের গিরিমাটি রং-এর দেওয়াল একটি বৃষ্টিপ্লাত অপরূপ বিকেলের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

ঢাকা বিষয়ে চিত্রকর্ম অঙ্কনে দেশি শিল্পী হিসেবে যার নাম জানা গেছে তিনি হলেন আলম মুসাব্বির। নিম্নে তাঁর আঁকা ঢাকার ঈদ ও মহররম মিছিলের কিছু চিত্রের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল:  
চিত্র নং - ১৮ ও ১৯: ঈদ ও মহররমের ছবি

### ঈদ ও মহররমের ছবি

কোম্পানি আমলের একজন দেশিয় চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বির। ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য হতে জানা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে অঙ্কিত ঈদ ও মুহাররম মিছিলের চিত্রকলা যা ঢাকার প্রাচীনতম জলরঙ চিত্রের নিদর্শন তা এই শিল্পীরই আঁকা। সর্বমোট ঊনচল্লিশটি চিত্ররাজির মধ্যে ২২টি ঈদ মিছিল এবং ১৭টি মুহাররম মিছিলের চিত্র। এই চিত্র আকারে ২৪ ইঞ্চি × ১৮ ইঞ্চি যা মুঘল যুগের দস্তানে আমির হামজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (২২ ইঞ্চি × ২৮.৫ ইঞ্চি)।<sup>৪০</sup> এই চিত্রগুলির মধ্য থেকে ১৭টি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে প্রদর্শনী কক্ষে শোভা পাচ্ছে। বাকিগুলো স্টোরে রাখা হয়েছে। দেশজ কাগজের উপর চিত্রিত এ শিল্পকর্মে আমরা প্রচুর পরিমাণে সবুজ, হলুদ, বাদামি ও কালো রঙের ব্যবহার দেখি। কালের সাক্ষী হয়ে চিত্রগুলো আজও সে যুগের নবাবী আমলের আনুষ্ঠানিকতা ও সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এ ছবিগুলোর সামগ্রিক বর্ণনা ভঙ্গি এতই স্পষ্ট ও নিখুঁত যে, তৎকালীন ঢাকার সাধারণ মানুষ, স্থান, প্রকৃতি ও পরিবেশ সমন্ধে জানা যায়।

এস এম তৈফুর তার *Glimpses of Old Dacca* গ্রন্থে ঈদ ও মহররম মিছিলের চিত্রগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার সরকার কিছু অর্থ খরচ করেছেন কলকাতার আর্ট কলেজে এই চিত্রগুলি retouch এবং বাঁধাইয়ের জন্য। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই চিত্রগুলি মুহাররমের সময় বেচারাম দেউড়ির একটি বাড়িতে প্রদর্শিত হতো।<sup>৪১</sup>

ঈদ ও মুহাররম মিছিলের জল রংয়ের ছবিগুলি ঐতিহাসিক আহমেদ হাসান দানী পুরানো ঢাকার বেচারাম দেউড়ির খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসনাত সাহেবের বাসা থেকে সংগ্রহ

করেছিলেন।<sup>৪৫</sup> এখানে উল্লেখ যে, আবুল হাসনাভের পূর্বে চিত্রগুলো ছোট কাটরায় বসবাসরত নবাব শায়েস্তা খাঁ'র বংশধরদের সংরক্ষণে ছিল।

উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল তিনটি মিছিল- ঈদ, মুহররম এবং জন্মষ্টামীর মিছিল। ঈদের মিছিল বা আনন্দ শোভাযাত্রা ঢাকার ঈদ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত এ মিছিল। মুঘল আমলে দিন্মিতে ঈদের সময় ঈদ মিছিল বের করা হত। ইতিহাসবিদদের ধারণা, ঢাকায় মুঘল আমল থেকেই ঈদের মিছিল শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে আশরাফ-উজ-জামান লিখেছেন: “ঢাকার মুঘল শাসনকর্তা ইসলাম খানের আমল থেকেই ঢাকায় ঈদ উৎসবের রেওয়াজ চালু হয়। খুব জাঁকজমকভাবে তখন ঈদ উৎসব পালিত হতো। ইসলাম খাঁ নবনির্মিত লালবাগ মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। ঈদের মিছিল বের হত। কেদ্বা থেকে ঘোড়সওয়ার ও ফৌজি বহর বেরিয়ে এসে যোগ দিত এসে মিছিলে। হাতিশালা থেকে হাতির দল নিয়ে এসে নানারকম সাজ সেজে মাছতরা যোগ দিত মিছিলে।”<sup>৪৬</sup> ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নওয়াব সিরাজদৌল্লার পতনের পর ঢাকার নায়েব নাজিমরা (উপনবাব) কোম্পানি সরকারের অধীনে ঢাকার শাসক ছিলেন। আর এই নায়েব নাজিমরা যখন নিমতলী প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন তখন তাদের উদ্যোগই অনুষ্ঠিত হত ঈদের মিছিল।

ঢাকার ঈদ মিছিল কবে ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল তাও জানা যায় না। খুব সম্ভব উনিশ শতকের মাঝামাঝি নায়েবে নাজিমদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেলে সমাপ্তি ঘটেছিল এ মিছিলের।

ঢাকায় মহররমের মিছিলও ছিল বিখ্যাত। মুঘল আমলে থেকেই ঢাকায় মহররমের মিছিল বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকার রাজপথে বের হতো। কোম্পানি আমলে নায়েবে-নাজিমদের সময়েও ঢাকায় মহররমের মিছিল অনুষ্ঠিত হত। ঢাকায় শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব ছিল মহররম এবং ঢাকার হোসেনী দালান ছিল এ ধর্মীয় উৎসবের প্রধান কেন্দ্র। এর বিভিন্ন উপাদান ছিল তবে বিখ্যাত ছিল মিছিল। এই মিছিলে শিয়ারাই মূলত যোগ দিলেও অন্যদের যোগদানের বাধা ছিল না এবং তা দেখার জন্য প্রচুর লোকজনের সমাগম হতো।<sup>৪৭</sup> বর্তমান শতকের প্রথমার্ধেও মিছিলের যে জাঁকজমক ছিল সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ক্রমেই তা হ্রাস পেয়েছে। এখন সকালে হোসেনী দালান থেকে মহররমের মিছিল বের হয়। সেখান থেকে বকশীবাজার, আজিমপুর, পুরানো পল্টন হয়ে বিকেলে ধানমন্ডির ঝিলে গিয়ে শেষ হয়।

## ঈদের মিছিল

ঈদের মিছিলের দুটি চিত্রের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলঃ

চিত্র নং- ১৮.১:



চিত্র নং- ১৮.১: ঈদের মিছিল. সৌজন্যে-বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ঈদের মিছিলের ১ম চিত্রের বর্ণনা : ঈদের মিছিলের ছবিটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে শিল্পী আলম মুসাব্বির কর্তৃক জল রংয়ে আঁকা। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঈদের মিছিলে হাতীর পিঠে হাওদার উপর বসে আছেন জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পেছনে সুউচ্চ মুঘল ধাঁচের তোরণ। এই তোরণটি নিমতলীতে বর্তমান এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্যে পড়েছে যা নিমতলীতে নায়েবে নাজিমদের প্রাসাদের তোরণ বলে সনাক্ত করা যায়। নবাব নুসরত জং-এর অন্যান্য প্রতিকৃতির সাথে মিল দেখে ধরে নেওয়া যায় যে মিছিলের অগ্রভাগে যিনি হাওদায় বসে আছেন তিনি নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জং। এ ছাড়া নিমতলীর সুউচ্চ তোরণ থেকে এ সত্যটি প্রমাণিত হয় যে ঢাকার নায়েবে নাজিমদের আবাসস্থল তখন কাটরা থেকে নিমতলীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মিছিলের পাশে সমান্তরালভাবে কিছু মানুষের প্রতিকৃতি দেখা যায় যারা নানা ধরনের পোশাকে আচ্ছাদিত। মানুষের মিছিলের মধ্যভাগে কয়েকজন অবগুষ্ঠিত নারী দেখা যায় তাদের সাথে খেলনা হাতে

দু'একটি শিশুকে দেখা যায়। এই নারীদের পশ্চাতে তৈজসপত্র মাথায় ধুতি পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখা যায়, যার পাশে রয়েছে অর্ধ উলঙ্গ এক সাধু ও তার শিষ্য। মিছিলের পাশে একটি বাড়ীর ছাদে কয়েকজন অবগুষ্ঠিত মহিলাদের দেখা যায় যারা অনুসন্ধিৎসু নয়নে মিছিলটি অবলোকন করছেন। এই চিত্রটির পশ্চাতে নিমতলী প্রাসাদের সুউচ্চ তোরণ। তোরণের দিকে চলে গেছে একটি প্রশস্ত রাস্তা এবং এই রাস্তার দু'পাশে কিছু বাড়ীঘর ও গাছপালা। শিল্পী এই চিত্রটিতে স্বার্থকভাবে ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময় দেশজ পরিপ্রেক্ষিত এবং শ্রেণীবদ্ধ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। যে সময় ঈদ ও মহাররমের মিছিলের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল ঢাকার নায়েবে নাজিমরা তখন ব্রিটিশদের ক্রীড়নক ছিলেন। নিমতলীর প্রাসাদে তারা প্রায় নজরবন্দী ছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক শান-শওকতে তারা ঢাকার মানুষদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

চিত্র নং -১৮.২:



চিত্র নং -১৮.২:ঈদের মিছিল. সৌজন্যে-বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ঈদের মিছিলের ২য় চিত্রের বর্ণনা: ঈদের মিছিলের এই চিত্রটিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে শিল্পী আলম মুসাব্বির কর্তৃক জল রংয়ে আঁকা। ঈদের মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল

সুসজ্জিত হাতির দলের শোভাযাত্রা। চিত্রটিতে দেখা যায় যে, নানা রকম জরি মখমল কাপড় দিয়ে হাতিগুলোকে সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি হাতির পিঠে হাওদা রয়েছে। আর বসার আসনটিতে নকশাকৃত রেলিং দেওয়া রয়েছে। এই শোভাযাত্রার সামনের সারিতে হাতির পিঠে সম্ভবত নায়েব-নাজিম নুসরত জং ও তার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বসেছেন। বরদার (বাহক) কৃত্রিম মুজা ও রৌপ্য তারের অলংকারযুক্ত শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক ছাতা তার উপর তুলে ধরছেন। ঈদ মিছিলে হাতির পিঠে হাওদায় বসে অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়েব-নাজিম নুসরত জং বাহাদুর। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র হতে জানা যায় যে, তাঁর পেছনের হাতিতে থাকতেন নবাবের ছোট ভাই শামুসদ্দৌল্লা। চিত্রটিতে আরো দেখা যায় যে ঈদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নায়েবে নাজিমগণ। নবাবদের সঙ্গে হাতি পিঠে সওয়ার হতে দেখা যায় ঢাকার জমিদার ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে। জানা যায় যে, এই শোভাযাত্রা মিছিলে অগ্রভাগে শুধু রাজ দরবারের লোকজন অংশ নিতেন। চিত্রে দেখা যায় যে, শোভাযাত্রাটি সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এ মিছিল নিমতলী প্রাসাদ থেকে শুরু হয়ে তখনকার বড় বড় রাজপথ ও মহল্লা অতিক্রম করত। আর যেসকল মহল্লাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল- নবাব কাটরা, দেওয়ান বাজার, হোসনী দালান, বকশী বাজার, বেগম বাজার, বেচারাম দেউরী, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, চক বাজার, গিরদে উর্দু রোড বর্তমানে উর্দু রোড প্রমুখ জায়গাগুলো। এ চিত্রটিতে আকাশের কাছে সুন্দর নির্মল আকাশ ওয়াশ করা হয়েছে।

## মহররম মিছিলের চিত্র

নিম্নে মহররম মিছিলের দু'টি চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হল:



চিত্র নং- ১৯.১: মহররমের মিছিল. সৌজন্যে-বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র নং- ১৯.১: মহররম মিছিলের ১ম চিত্রের বর্ণনা: মহররম মিছিলের এই চিত্রটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে শিল্পী আলম মুসাব্বির কর্তৃক জল রংয়ে আঁকা। এই চিত্রটিতে তীরবিদ্ধ অবস্থায় ইমাম হোসেনের ঘোড়া 'দুলদুল' সঙ্গে রয়েছে তলোয়ার হাতে ছয়জন ব্যক্তি। মহররম মিছিলের এই চিত্রটি জলরংয়ের অঙ্কিত চমৎকার একটি নমুনা। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতি, পেশা ও সামাজিক স্তরের মানুষদের উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্রকর্মটির পেছনে দোতলা কুঁড়েঘর এবং গাছের সারি চমৎকারভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

চিত্র নং-১৯.২:



চিত্র নং- ১৯.২:মহররমের মিছিল. সৌজন্যে-বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মহররম মিছিলের ২য় চিত্রের বর্ণনা মহররম মিছিলের এই চিত্রটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে শিল্পী আলম মুসাব্বির কর্তৃক জল রংয়ে আঁকা। এই চিত্রটিতে দেখা যায় যে, হাতির পিঠে চড়ে ঢাকার অধিবাসীরা নিশানসহ মিছিলে বের হয়েছে। নিশানে লেখা 'ইয়া ফাতাহ বা ইয়া আলী' অর্থ 'বিজয় হে আলী'। নানা রকম জরি মখমল কাপড় দিয়ে হাতিগুলোকে সাজানো হয়েছে। মিছিলটি যে বাড়িটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে সে বাড়িটির জানালা হতেও দু'জন অবগুষ্ঠিত নারী ও একটি ছোট বালক দেখা যায় যারা উৎসুক দৃষ্টিতে মিছিলটিকে অবলোকন করছে। আরো দেখা যাচ্ছে যে বাড়িটির ছাদে বেশ কিছু উৎসুক মানুষের সমাগম দেখা যায় যারা অনুসন্ধিৎসু নয়নে এই বর্ণাঢ্য রাজকীয় মহররম মিছিলটি উপভোগ করছে।

উপর্যুক্ত ইউরোপীয় শিল্পী ও আলম মুসাব্বির ছাড়াও ঢাকায় আরো কিছু আকর্ষণীয় চিত্র এঁকেছিলেন এক অনামা শিল্পী:

## চিত্র নং-২০: প্যানোরমা অব ঢাকা

মুঘল ও কোম্পানি আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে যে ঢাকা শহর গড়ে উঠেছিল, তার ডানদিকে অবস্থিত পাগলা থেকে বাঁ দিকে লালবাগ এলাকা পর্যন্ত দৃশ্যপটটি ‘প্যানোরমা অব ঢাকা’ নামে পরিচিত চিত্রকর্ম। এটি কতিপয় অনামা শিল্পী জল রংয়ে আঁকেছিলেন এবং পরে তা লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে অঙ্কিত হয়। এটি আঁকানোর উদ্যোগ নেন এবং অর্থের জোগান দেন তৎকালীন ঢাকার সিভিল ও সেশন জজ ফ্রান্সিস গ্রিফিথ কুক। ‘প্যানোরমা অব ঢাকা’ নামে লিথোগ্রাফটি ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের ১১৪, নিউ বন্ড স্ট্রিট থেকে। প্রকাশক ছিলেন মের্সাস ডিকিনসন।<sup>৪৭</sup> দৃশ্যপটটির নিচে প্রায় ৪৩টি স্থাপনা ও বাড়িঘর দেখা যায় যাতে রয়েছে হাতে লেখা পরিচিতি। এই চিত্রসমূহ মুঘল তথা বৃটিশ আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে অভিজাত ধনীরা বাড়িঘর নির্মাণ করেছিলেন, যা ‘প্যানোরমা অব ঢাকা’ নামক লিথোগ্রাফটিতে ফুটে ওঠেছে। নদীর তীর বরাবর পাগলা থেকে লালবাগ পর্যন্ত যে ৪৩টি ভবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল: ১) ভাওয়াল জমিদারীর প্রাক্তন ম্যানেজার এফ, ম্যাককেমেরুনের বাংলো, ২) ঢাকা সুগার কোম্পানি ওয়ার্কস (বর্তমান মিল ব্যারাক) ও ম্যানেজারের বাস ভবন, ৩) ওয়াস্টার সাহেবের সাসপেনশন ব্রিজ, ৪) মথুর পোন্দারের ঘাট, ৫) জমিদার আরাতুনের বাড়ি, ৬) জীবন বাবুর বাড়ি, ৭) ঢাকা কালেক্টর ভবন, ৮) প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন জে ব্রেইলির বাড়ি, ৯) ঢাকার পোস্টমাস্টার হান্সরফোর্ডের ভবন, ১০) সেশন জজ কুকের ভবন, ১১) জমিদার এ হ্যালোর বাড়ি, ১২) সুপারিনটেন্ডেন্ট সার্জন ড. ল্যান্ডের বাড়ি, ১৩) নীলকর ও জমিদার ই. কে. হিউমের বাড়ি, ১৪) সেন্ট থমাসের গির্জা, ১৫) ঢাকা বিলিয়াড গির্জা, ১৬) রেভিনিউ কমিশনার জে ডানবারের বাড়ি, ১৭) ডব্লিউ এইচ জোনসের বাড়ি, ১৮) জয়েন্ট স্টক সুগার কোম্পানির ফ্যাক্টরি, ১৯) ব্যাপটিষ্ট মিশনারী রেভারেন্ড মি. রবিনসনের বাড়ি, ২০) মের্সাস ওয়াইজ এন্ড গ্লাস, ২১) মের্সাস ওয়াইজ এন্ড গ্লাস, ২২) আদালত বা কোর্ট বিল্ডিং, ২৩) রেভারেন্ড শের্ফার্ড বাড়ি, ২৪) মীর্জা গোলাম পীরের বাড়ি, ২৫) খাজা আলিম উল্লাহর বাড়ি, ২৬) আমির উদ্দিন দারোগার বাড়ি, ২৭) আর্মেনী মানুষের বাড়ি, ২৮) আমির উদ্দিন দারোগার স্মৃতিসৌধ, ২৯) হিন্দু মঠ, ৩০) নবাব প্রাসাদে ফটক, ৩১) পোগজের বাড়ি, ৩২) মীর্জা গোলাম পীরের বাড়ি, ৩৩) গোলাপ পীরের মসজিদ, ৩৪) রেভারেন্ড লেওনার্দোর বাড়ি, ৩৫) নানুক মিঞার বাড়ি, ৩৬) ছোট কাটরা, ৩৭) ঢাকার কমিশারের অফিসার ক্যাপ্টেন সোয়াটম্যানের বাড়ি, ৩৮) বড় কাটরা, ৩৯) মৌলভী



হাফিজউল্লাহর বাড়ি, ৪০) মীর্জা আনু আলী ও মোহাম্মদ আলীর বাড়ি, ৪১) নাজির নাটু সিংহের মঠ, ৪২) লালবাগের ধ্বংসাবশেষ, ৪৩) জগৎশেঠের ব্যাংকের ঢাকা শাখা।

উল্লিখিত স্থাপনা ও বাড়িগুলো মুঘল ও উপনিবেশিক আমলের শৈলীর প্রভাব দেখা যায়। বাড়িগুলোর মধ্যে এক ধরনের স্থাপত্যিক ঐক্য আছে। বাড়িগুলি ইটের তৈরী, ব্যবহৃত হয়েছে খিলান। বড় বারান্দা, উঁচু ছাদ, পুরু দেওয়াল। স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইনের মতে, “থোকোরোমান, ইন্দোসারসনিক এবং ইংলিশ কান্ট্রিসাইডের বাড়ির স্টাইল সব একীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক মিশ্ররীতি।”

আমরা এখানে প্যানোরমা অব ঢাকার কমিশারিয়েট অফিসার ক্যাপ্টেন সোয়াটম্যানের বাড়ি, বড় কাটরা, মৌলভী হাফিজউল্লাহর বাড়ি, মীর্জা আনু আলী ও মোহাম্মদ আলীর বাড়ী, নাজির নাটু সিংহের মঠ ইত্যাদির দৃশ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করছি।

চিত্র নং- ২০.১: প্যানোরমা অব ঢাকা, ১৮৪০, শিল্পী অজ্ঞাত



চিত্র নং- ২০.১: প্যানোরমা অব ঢাকা, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

কমিশারিয়েট অফিসার ক্যাপ্টেন সোয়াটম্যানের বাড়ি : ছোট কাটরার থেকে খানিকটা দূরে ছিল কমিশারিয়েট অফিসার ক্যাপ্টেন সোয়াটম্যানের দোতলা বাড়ি। বাড়িটি ইংলিশ কান্ট্রিসাইডের

বাড়ির স্টাইলে নির্মিত, স্থাপত্যশৈলী দেখা যায় বড় বারান্দা, উঁচু ছাদ, করিষ্টিয়ান পিলার। আর পাশে চিত্রে দেখা যাচ্ছে বড় কাটরাকে।

**বড় কাটরা:** ১৮৪০ দিকে আঁকা প্যানোরমা অব ঢাকাতে বড় কাটরাকে ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত জাঁকালো, সুন্দর এবং বিশাল এক অট্টালিকা হিসাবে দেখা যাচ্ছে। ১৮২৩ সালে চার্লস ড'য়লির অঙ্কিত চিত্রে উত্তর দিকে ফটকটি দেখা গিয়েছিল ধ্বংসের পথে। এই নিসর্গ দৃশ্যপটে যদিও এর পুরো অংশটি আসেনি তবে দেখে মনে হয় ড'য়লি যে অবস্থায় দেখেছিলেন তার বেশি ব্যতিক্রম হয়নি। এতে স্থাপত্যশৈলীতে দেখা যায় ইওয়ান আকারে প্রবেশপথ, বিশালকার বুরুজ, পুরু দেওয়াল যা ইন্দো পারসিক স্টাইলে নির্মিত।

**মৌলভী হাফিজউল্লাহর বাড়ি, মীর্জা আনু আলী ও মোহাম্মদ আলীর বাড়ি:** বড় কাটরার পাশে ছিল এই বাড়ি দুইটি। চিত্রে বাড়ি দুটিকে ভালো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। মীর্জা আনু আলী ও মোহাম্মদ আলী ছিলেন পুরানো নবাবদের বংশধর। বড় কাটরার সামনে ও আশপাশের অংশটুকু তাদের দখলে ছিল। এখন অবশ্য বাড়ি দুটির কোন চিহ্ন নেই। চিত্রে বাড়িগুলোকে দেখা যায় গ্রোকোরোমান স্টাইলে নির্মিত, উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে ওঠেছে করিষ্টিয়ান পিলার, উঁচু ছাদ, পার্শ্ববুরুজ প্রভৃতি।

চিত্র নং- ২০.২ :



চিত্র নং- ২০.২: প্যানোরমা অব ঢাকা, উৎস-শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭

নাজির নাটু সিংহের মঠ : এটি নির্মিত হয়েছিলো নাজির নাটু সিং ও তাঁর মায়ের দেহাবশেষের ওপর। স্থানীয় লোকজন এটিকে চিনতেন 'নাজিরের মার মঠ' বলে। এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। চিত্রে এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মূল মঠটি দ্বিতল, উঁচু ছাদ, চতুষ্কোণাকার, কলস আকৃতির চূড়া। পাশে দেখা যায় আরেকটি চতুষ্কোণাকার মন্দির যার অগ্রভাগ পিরামিড আকৃতির যা বাংলার টৌচালা রীতিকে অনুসরণ করে নির্মিত।

কোম্পানি আমলে ঢাকায় বেশ কয়েকজন ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রকর এসেছিলেন। তারা ঢাকার ভগ্ন প্রায় ইমারত, নিসর্গদৃশ্য, আচার-আচরণ, ধর্মীয় উৎসবের বেশ কিছু চিত্র অঙ্কন করেন। সেগুলো থেকেই কয়েকটি চিত্র বিষয়বস্তুর সহকারে উপরোক্ত অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ:

০১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৯, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৭৮
০২. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোব*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ৩৬৫
৩. নাজির হোসেন, *কিত্বদস্তির ঢাকা*, ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লি., ১৯৯৫, পৃ. ২০
৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৪, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৪৫৩
৫. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২
৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৪, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ৪৫৩
৭. নাজির হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩২২
৯. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী - ১ম খণ্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০, পৃ. ২৪৪
১০. মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
১১. জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, অনুদিত-মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬০
১২. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোব*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ৪০৮
১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১০, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫১৩
১৪. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩
১৫. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১ম খণ্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০, পৃ. ১৬৭
১৬. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

১৭. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৫৭
১৮. মুনতাসির মামুন, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৯৩
১৯. মুনতাসির মামুন, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে*, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন, ১৯৯৬, পৃ. ৪২
২০. F. Karim Khan & Nazrul Islam, *High class residential areas in Dacca city*, The Oriental Geographer, V-III, London: 1964, p. 4
২১. মুনতাসির মামুন, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৪৫
২২. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ১০০
২৩. James Taylor, *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca*, London: 1851, pp. vii-xi
২৪. আবদুল করিম, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৮
২৫. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২০৩
২৬. নাজির হোসেন, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৬৯
২৭. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১ম খণ্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০, পৃ. ৮৯
২৮. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৫৩
২৯. আর্থার লয়েড ক্রে, *ঢাকা: ক্রে'র ডায়েরী*, রূপান্তর: ফওজুল করিম, ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০, পৃ. ২৬
৩০. মুনতাসির মামুন, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৭২
৩১. *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৩
৩২. মুনতাসির মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১ম খণ্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০, পৃ. ১৬৩
৩৩. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৬১
৩৪. মুনতাসির মামুন, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৫৪
৩৫. নাজির হোসেন, *প্রাণ্ডক্ত* পৃ. ৩৩৩
৩৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১২০

৩৭. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ২৩৭
৩৮. *প্রান্তর*, পৃ. ২৩৭
৩৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-০৭, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৪৯
৪০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-০৯, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৯
৪১. শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *প্রান্তর*, পৃ. ৩৫১
৪২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-০৯, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৯০
৪৩. নাজমা খান মজলিস, *ঢাকার ঈদ ও মুহররম মিছিলের চিত্রকলার রূপরেখা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, সংখ্যা -২৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০.
৪৪. S. M Taifoor, *Glimpses of old Dacca*, Dhaka: Lulu Bilkis Banu etal, 1956, p. 236
৪৫. মুনতাসির মামুন, *পুরানো ঢাকার: উৎসব ও ঘরবাড়ি*, ঢাকা: প্রকাশক - শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩
৪৫. আশরাফ-উজ-জামান, *ঢাকার ঈদ, পাক্ষিক অন্যান্য ঈদ*, ঢাকা, ১৯৯৭
৪৬. *প্রান্তর*, পৃ. ১৮৩
৪৭. শামীম আমিনুর রহমান, *শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ২৭

## চতুর্থ অধ্যায়

কোম্পানি আমলে কলকাতা ও ঢাকার চিত্রকলার  
তুলনামূলক আলোচনা

## চতুর্থ অধ্যায়

### কোম্পানি আমলে কলকাতা ও ঢাকার চিত্রকলার তুলনামূলক আলোচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তগত হবার পর তাদের অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ করার সুযোগ হয়। শুধু ভাগ্যান্বেষীরাই নয়, অনেক পর্যটক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিও তখন থেকে এদেশে আসতে থাকেন। আর এ সুবাদে এদেশে আসে ইংরেজ ও ইউরোপীয় পেশাদার বা শৌখিন চিত্রশিল্পীরা। তারা এদেশে এসে বিভিন্ন বিষয়ে চিত্র আঁকেছেন। এসকল চিত্রশিল্পীদের পাশাপাশি ইংরেজ বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশি শিল্পীরাও এ সময় নানা বিষয়ে চিত্র আঁকেন। ইউরোপীয় যেসব শিল্পী এদেশে এসে ছবি আঁকেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই বোম্বে, লঙ্কৌ, মাদ্রাজ বা কলকাতায় বসবাস করেছিলেন। তাই তাঁদের ছবির বেশিরভাগই সেসব জায়গার মানুষ ও প্রকৃতি ঘিরে। পেশাদার বা শৌখিন চিত্রশিল্পীদের খুব অল্পসংখ্যক পূর্ব বাংলা বা ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় আসা পেশাদার শিল্পী ও ঢাকার ওপর তাদের চিত্রকর্মের সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতের অন্যান্য শহর, বিশেষ করে কলকাতার ওপর এসব পেশাদার বা শৌখিন শিল্পীর আঁকা এক বিশাল চিত্রসম্ভার রয়েছে। ঢাকায় আঁকা পেশাদার ও শৌখিন চিত্রশিল্পীদের যে কয়েকটি চিত্র রয়েছে তারই সাদৃশ্যপূর্ণ কলকাতায় আঁকা কয়েকটি চিত্র ও সাথে আরো কিছু চিত্রসম্ভারের মধ্যে একটি স্বল্প পরিসরের তুলনামূলক আলোচনা এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও এই তুলনা খুব একটা বিস্তারিত হবে না কারণ ঢাকায় আসা পেশাদার শিল্পী ও ঢাকার ওপর তাদের চিত্রকর্মের সংখ্যাটা কলকাতায় বসবাসরত শিল্পীদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় শিল্পী যারা বাংলায় পদার্পন করেছিলেন বেশিরভাগই ছিলেন সরকারি আমলা ও কর্মচারী তবে অল্প কিছু সংখ্যা শিল্পী এসেছিলেন শৌখিন শিল্পী তাদের ভাগ্যানেষণে। সরকারি আমলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এদেশের মানুষ, তাদের আচার-আচারণ, প্রকৃতি, পরিবেশ, স্থাপনা, শিল্পকলা, এদেশের বিচিত্র জীব-বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র ও স্কেচের মাধ্যমে তৈরি নথি ও অ্যালবাম শাসকদের কাছে তথ্য হিসেবে সরবরাহ করা যাতে তারা এদেশের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারে এবং শাসনকার্য উত্তমরূপে পরিচালনা করতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনার



অবকাঠামো তৈরি করে জনগনের জন্য রাস্তাঘাট, সাঁকো-সেতু নির্মাণ এবং তাদের ব্যবহার্য মুদ্রা, পরিমাপ-পদ্ধতি চালু করতে হয়েছে। লেখক শামীম আমিনুর রহমান মন্তব্য করেন যে...সবচেয়ে জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল স্থানীয় সব শিল্পকর্ম, কারিগরি দক্ষতা, স্থাপত্যবিদ্যা আর ভবন নির্মাণ-কৌশলের একটা অনুমান পাওয়া, যাতে খুব সফল আর প্রতিরোধহীনভাবে একটা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।<sup>১</sup>

ঢাকায় যে সকল চিত্রকররা এসেছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সিভিলিয়ান। ড'য়লি বা অন্য সিভিলিয়ানরা ঢাকায় এসেছিলেন চাকরির কারণে। চাকরি প্রয়োজনে তাঁদের ছবি আঁকা প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। “ব্রিটিশ রাজের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য চিত্রাঙ্কনে অভিজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারটি ছিল অত্যাৱশ্যক। বিশেষ করে, যারা কালেক্টরেটে নিয়োগ পেতেন, নানা ধরনের ইমারত, রাস্তাঘাট ইত্যাদির নকশা তৈরি করা তাঁদের কাজেরই অংশ ছিল। ক্যামেরা উদ্ভাবনের আগে ছবি আঁকায় দক্ষতা অর্জন ছিল ওই সব কর্মকর্তাদের জন্য একটি আবশ্যিক শর্ত।”<sup>২</sup>

১৮৫৭ সালে মহাবিপ্লবের ফলে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান এবং সরাসরি ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এসময় প্রশাসনিক রাজধানী হিসেবে কলকাতা মহানগরের উত্থান ও গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের পতন ত্বরান্বিত হয়। কলকাতা হয়ে ওঠে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের অনেক শিল্পী কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কলকাতায় এদেশীয় শিল্পীদের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের পত্নী মিসেস ইম্পের। মিসেস ইম্পের পাটনা হতে অন্তর্গত তিনজন দেশি শিল্পীকে দিয়ে তাঁর গড়ে তোলা চিড়িয়াখানার পশুপাখির ছবি আঁকার জন্য নিয়োজিত করেন। মিসেস ইম্পের ছাড়াও বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ ব্যক্তিবর্গের প্রবল কৌতূহল মনোভাবের কারণেই এদেশের মানুষ, পুরাকীর্তি, স্থাপত্য, প্রকৃতি-পরিবেশ, নিসর্গ দৃশ্য, পশুপাখি, পেশাজীবন, উৎসব, প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পীদের তুলিতে চিত্রিত হয়েছে।

কোম্পানি আমলে শিল্পকলা যা মূলত ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজরা একে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকলা নতুন যুগে পদার্পণ করে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিকতার সূচনালগ্নে বিভিন্ন

বিষয়বস্তু নিয়ে বেশকিছু কাজ হয়েছিল। যেমন: “শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের ফল-ফুল-লতা-পাতার প্রায় আড়াই হাজার সাদৃশ্যধর্মী ছবি এঁকেছিলেন ভারতীয় শিল্পীরা। অনেক ভারতীয় শিল্পী ১৮০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুরের ‘ইনস্টিটিউট অব প্রোমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’র পশুশালার পশুপাখি আঁকার কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।”<sup>৩</sup> প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যের ছবি ও নকশা এঁকেছিলেন কোম্পানি শিল্পীরা। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় ছবিও তখন আঁকা হয়।

কোম্পানি শৈলীর চিত্রকরেরা নানা পেশার মানুষজনের ছবি এঁকে ইংরেজ ফ্রেতাদের কাছে বিক্রয় করেন। এই ধরনের কিছু সেট ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি যা বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরির অন্তর্গত ও অন্যান্য সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

ঢাকায় নায়েবে নাজিম নুসরাত জঙ্গের সময়কালে (১৭৮৬-১৮২২ খ্রি.) মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছিল তাঁর দরবারে। এমনি একজন শিল্পীর নাম জানা যায়। তিনি হলেন আলম মুসাব্বির। তিনি অঙ্কন করেন তৎকালীন ঢাকার বাড়িঘর, অলি-গলি, মুঘল মসজিদ, হোসেনী দালান, চকবাজার, নায়েবে নাজিমদের নিমতলীর প্রাসাদ এবং ঢাকার ঈদ উৎসব ও মহররম মিছিলের ছবি।<sup>৪</sup> বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত সেই সময়কার কিছু জলরঙের চিত্রের মধ্যে আছে ১৭টি ঈদের মিছিল ও মেলার ছবি এবং ২২টি মহরমের মিছিলের ছবি। এগুলো আলম মুসাব্বির ও তাঁর শিষ্যদের সমভিব্যাহারে আঁকা বলে মনে করা হয়।<sup>৪</sup>

ইউরোপীয়দের কাছে ভারত ছিল এক রহস্যভরা বিস্ময় ও ধন-সম্পদের দেশ। কোম্পানি আমলে ও ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পী ভারতে আসতে থাকে বিস্তারিত হওয়ার আশায়। তবে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এ সময়কালে প্রায় ষাট জনেরও অধিক বিদেশী চিত্রকরে এদেশে এসেছিলেন।<sup>৫</sup> এসব শিল্পীরা প্রধানত তিনটি মাধ্যমে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন যেমন- (ক) ক্যানভাসে তেলরং, (খ) হাতির দাঁতের উপর জলরঙে অনুচিত্র, এবং (গ) কাগজের উপর জলরং চিত্র ও তা থেকে এনগ্রেভিং পদ্ধতির ছাপাই ছবি। এসকল বিদেশি শিল্পীদের অধিকাংশ ছিলেন মধ্যম মানের শিল্পী। তাঁরা তাঁদের চিত্রকর্মের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, গৃহস্থালীর উপকরণ উৎপাদন প্রথা, যুদ্ধ, জল ও স্থলপথের বিভিন্ন যানবাহন, ধর্মানুষ্ঠান, পালপার্বণ, প্রকৃতি, ঘরবাড়ি, জনজীবন,

খাদ্য ও পরিচ্ছদ, ইত্যাদির এক নির্ভরযোগ্য চিত্র এগুলিতে আঁকা রয়েছে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপারিসীম। “এছাড়া এঁদের চিত্রকলা ভারতীয় উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় বাস্তববাদী শিল্পধারায় আসক্ত করে তোলে, যা ভারতীয় শিল্পের পরবর্তী রূপ পরিগ্রহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।”<sup>৬</sup>

কলকাতা ও ঢাকার চিত্রসম্ভারগুলোর মধ্যে একটি স্বল্প পরিসরের তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য কলকাতার বিদেশি চিত্রকরদের আঁকা কয়েকটি চিত্র ও ঢাকায় আসা বিদেশি চিত্রকরদের আঁকা কয়েকটি চিত্রের বর্ণনা ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হল।

### তুলনামূলক আলোচনা - ১



চক ও হোসেনি দালান



ক্লাইভ স্ট্রিটের দৃশ্য

চিত্রকর- চার্লস ড'য়লি

চার্লস ড'য়লি কলকাতায় আঁকেন 'ক্লাইভ স্ট্রিটের দৃশ্য'। এই চিত্রে দেখা যায় সেকালে কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটের ব্যস্তময় পরিবেশ। চিত্রটি লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে অংকিত। ক্লাইভ স্ট্রিটের বিশাল দালানগুলো, নানা পেশার মানুষ, বিভিন্ন শকট, ঘোড়া, সেকালে ক্লাইভ স্ট্রিটের আশেপাশের ছনের চৌচালা ঘরবাড়ি ও পরিবেশ চিত্রটিতে ফুটে ওঠেছে। চিত্রটিতে যে ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখা যায়, ঠিক একই পরিবেশ-পরিস্থিতি আমরা লক্ষ করি ঢাকায় চার্লস ড'য়লির আঁকা 'চক ও হোসেনি দালান' বিষয়ক চিত্রটিতে। এখানেও দেখা যায় একটি দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্তময় পরিবেশ, নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ, হাতি, উট, অপূর্ব স্থাপত্য নকশার হোসেনি দালান। অর্থাৎ

চিত্রগুলো অবলোকন করে এই কথা বলা যায় যে, চিত্রকরের যেকোন জায়গাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকম যা তিনি তার চিত্রে তুলে ধরেছেন। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হল চিত্র দু'টি একই চিত্রকরের আঁকা।

### তুলনামূলক আলোচনা- ২



টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ,



আলিপুরের ঝুলন পুল

চিত্রকর- চার্লস ড'য়লি

কলকাতায় চার্লস ড'য়লির রং ও তুলিতে আমরা আরেকটি চিত্র দেখি তা হল 'আলিপুরের ঝুলন পুল'। বর্তমানে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। পুলটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি লোহার তৈরি, আর্চ বা খিলান আকৃতির ও ঝুলন্ত অবস্থায় চিত্রে দেখা যায়। পুলটির উপর লোকজন যাতায়াত করছে। পুলটির নিচে নদীতে কয়েকটি নৌকা চলাচল করতে দেখা যায়। নদীর পাড়ে দেখা যায় কয়েকজন মানুষকে এবং একটি গরুকে নদীর পাড়ে পানি খেতে যাচ্ছে দেখা যায়। ঠিক এই ধরনের চিত্র আমরা দেখতে পাই ঢাকাতে। যেমন: টঙ্গীর পুল, পাগলার পুল ইত্যাদি। এই চিত্রগুলোতে আমরা একই ধরনের দৃশ্য দেখতে পাই। অর্থাৎ চিত্রগুলোর বর্ণনা হতে একটি বিষয় আবারো লক্ষণীয় সেটি হল একই চিত্রকরের আঁকা এবং বিষয় নির্বাচনে সাদৃশ্যতা।

তুলনামূলক আলোচনা- ৩



ধোলাই ঝালের দিক থেকে দেখা ঢাকা শহর

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কলকাতার দৃশ্য

শিল্পী: চার্লস ড'য়লি

শিল্পী: উইলিয়াম হজেস

499237

ঢাকায় একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই চার্লস ড'য়লির আঁকা 'ধোলাই ঝালের দিক থেকে দেখা ঢাকা'। ধোলাই খাল হতে চিত্রকরের দৃষ্টি ঢাকা শহরের যতখানি অংশ নিবন্ধ করেছিল তারই দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে এই চিত্রে। কলকাতায় একই ধরনের ও বিষয়ে চিত্র অংকন করেন উইলিয়াম হজেস, শিরোনাম 'ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কলকাতার দৃশ্য'। অর্থাৎ এখানেও হজেস ফোর্ট উইলিয়াম হতে কলকাতাকে কিরূপ দেখাতো বা তার দৃষ্টি যতটুকু গেছে তারাই দৃশ্য এই চিত্রে অঙ্কন করেন। অর্থাৎ এই দু'টি চিত্রের শিরোনাম ও বর্ণনা হতে বোঝা যায় যে, পৃথক পৃথক চিত্রকরের অঙ্কন হলেও চিত্রকরদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, সে স্থানের চিত্র অঙ্কনে বিষয়ের ক্ষেত্রে বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

ঢাকা  
বিশ্ববিদ্যালয়  
প্রত্নতাত্ত্বিক  
প্রত্নতাত্ত্বিক

## তুলনামূলক আলোচনা- ৩



ঈদ মিছিল

শিল্পী: আল মুসাব্বির



চড়ক পূজার চিত্র

শিল্পী: উইলিয়াম হজেস

ঢাকায় দেশী শিল্পী আলম মুসাব্বির আঁকেন ঈদ ও মহররম মিছিলের চিত্র। এই চিত্রগুলোতে তিনি খুবই সুন্দরভাবে শোভাযাত্রার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রে দেখা যায় হাতীর পিঠে হান্দাদার উপর বসে আছেন জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মিছিলের পাশে সমান্তরালভাবে কিছু মানুষের প্রতিকৃতি দেখা যায় যারা নানা ধরনের পোষাক-আশাকে আচ্ছাদিত। ঈদের মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুসজ্জিত হাতির দলের শোভাযাত্রা। ছবিতে দেখা যায় নানা রকম জরি মখমল কাপড় দিয়ে হাতি সাজানো হয়েছে। এই শোভাযাত্রায় সামনের সারিতে হাতির পিঠে সম্ভবত সে সময়ের ঢাকার নায়েবে নাজিম নুসরত জং কে দেখা যায়। এই শোভাযাত্রার তার পরিচারককে দেখা যায় আনুষ্ঠানিক ছাতা নায়েব নাজিম নুসরত জং-এর উপর তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে কলকাতায় চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে 'চড়ক পূজার চিত্র' অঙ্কন করেন উইলিয়াম হজেস। এখানেও দেখা যায় বিরাট চড়ক পূজার শোভাযাত্রার মিছিল, শকট, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও এই মিছিলের যাত্রায় দেখা যায়। বড় বড় ছাতা হাতে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে মিছিলে। এই দুইটি চিত্র পাশাপাশি রেখে বর্ণনা করলে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় সেটি হলো দু'টি চিত্র দু'জন চিত্রকর অঙ্কন করলেও তাদের চিত্র অঙ্কনের বিষয় নিবার্চনে সাদৃশ্যতা এবং চিত্রের প্রেক্ষাপট রচনায় রয়েছে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি।

## তুলনামূলক আলোচনা- ৪



সেক্রেড হাট চার্চটি

মন্দির ও শহর কুঁড়েঘর

শিল্পী: চার্লস ড'য়লি

পূর্বেই ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল চিত্রকরেরা এসেছেন তারা সকলেই এখানকার নানা বিষয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন। এদের মধ্যে ধর্মীয় স্থাপনাগুলো বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল হয়ত চিত্রকরদের মধ্যে। কারণ কলকাতা ও ঢাকা এই দু'টি জায়গায় আমরা চিত্রকরদের আঁকা ধর্মীয় স্থাপনার ও ধর্মীয় রীতি-নীতির চিত্র পাই। কলকাতায় একটি চিত্র খুঁজে পাই আমরা চার্লস ড'য়লির আঁকা 'সেক্রেড হাট চার্চটি' অন্যদিকে ঢাকাতে আমরা দেখতে পাই চার্লস ড'য়লির আঁকা 'সাইফ খানের মসজিদ', জোসেফ স্কট ফিলিপস আঁকা 'রমনা মন্দির' 'বেনিয়াজুড়ির মন্দির' ইত্যাদি।

### তুলনামূলক আলোচনা- ৫



সেকালের বাংলাদেশের একটি খামার বাড়ির

ঢাকার আধুনিক বাসস্থান'।

শিল্পী: উইলিয়াম হজেস।

শিল্পী: জর্জ চিনারি

ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রকররা এসেছিলেন এবং এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছেন তাঁরা সেখানকার ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট অঙ্কন করেছেন। তাদের মধ্যে কলকাতায় উইলিয়াম হজেস অঙ্কন করেছেন সেকালের 'বাংলাদেশের একটি খামার বাড়ির দৃশ্য'। চিত্রে দেখা যায় বিশাল উঠান, ছনের কয়েকটি ঘর, গাছ-গাছালি এবং খেলায় রত দু'টি শিশু প্রভৃতি। অন্যদিকে ঢাকায় জর্জ চিনারী অঙ্কন করেছেন 'ঢাকার আধুনিক বাসস্থান'। এই চিত্রটিতেও আমরা লক্ষ করি ছনের ঘর, গাছগাছালি, গৃহটিতে বসবাসকারীদের আসবাবপত্র ও একজন রমণী প্রভৃতি।

### তুলনামূলক আলোচনা - ৬

কলকাতায় ও ঢাকায় চিত্রকরদের আঁকা বিষয়বস্তুর মধ্যে আরও স্থান পেয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকদের পেশা। ঢাকায় জর্জ চিনারী অঙ্কন করেন 'মসলিন বয়নরত জনৈক তাঁতী'। কলকাতায় সলভিল অঙ্কন করেন 'তাঁতী', 'ডাকহরকরা', 'পেয়াদা', 'পক্ষীমার', 'দৈবজ্ঞ' ইত্যাদি নানা পেশার মানুষের চিত্র।





উটের গাড়ি - অ্যাটকিনসন

ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রকররা কলকাতায় অঙ্কন করেন যানবাহনের চিত্র। যেমন চিত্রকর অ্যাটকিনসন অঙ্কন করেন কলকাতায় রাস্তায় চলাচলকারী উটের গাড়ি। চিত্রটিতে দেখা যায় একজন সহিস বেত্রাঘাত করে একটি উটকে চালিত করছেন, উটটি চাকা চালিত মানুষ বহনকারী গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনে আরো দু'জন বাহক তাকে সাহায্য করছে। চিত্রটি সেকালে মানুষের জীবনাচরণের একটি বাস্তব দৃশ্য ধারণ করেছে।

#### ভুলনামূলক আলোচনা - ৭



পাদ্রী সাহেব খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন  
শিল্পী- অ্যাটকিনসন



বড়বাজারে নানান মুখের মেলা — কোলেসওয়ার্ডি গ্রাফি

বড়বাজারের নানা মুখের মেলা  
শিল্পী- কোলেসওয়ার্ডি গ্রাফি

কলকাতায় ইংরেজ চিত্রকররা অঙ্কন করেন সেখানকার মানুষের জীবনাচরণ ও আচার-অনুষ্ঠানের চিত্র। যেমন: ইংরেজ চিত্রকর কোলেসওয়ার্ডি গ্রান্ট অঙ্কন করেন 'বড়বাজারের নানা মুখের মেলা'। চিত্রে দেখা যায় অসংখ্য নানা জাতির মানুষের মুখের সমাবেশ। শিল্পী বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তাদের উপস্থাপনা করেছেন। এই চিত্রকরের আঁকা আরেকটি চিত্র দেখা যায় পাদ্রী সাহেব খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন। চিত্রটিতে দেখা যায় একজন পাদ্রী কলকাতার কোন একটি জায়গায় দাড়িয়ে এদেশীয় নানা বয়সের লোকদের খ্রিষ্টধর্মের মহিমা প্রকাশ করছেন।

### তুলনামূলক আলোচনা - ৮



শিবপুরের বিশপস কলেজ



মগবাজার মসজিদ

ভারতীয় উপমহাদেশে আসা ইংরেজ চিত্রকরদের চিত্রে স্থাপনাগুলো বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। যেমন কলকাতায় দেখা যায় 'শিবপুরের বিশপস কলেজ', ইউরোপীয়দের তৈরি বাড়ি-ঘর, মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি। ঢাকায় আঁকা স্থাপনের মধ্যে বেশিরভাগই মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির, স্থানীয় ও ইউরোপীয়দের নির্মিত বাড়ি-ঘর ইত্যাদি।

পরিশেষে এই স্বল্প পরিসরের আলোচনা হতে এতটুকুই ফুটে ওঠে যে, দু'টি জায়গার পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আচরণ, ভিন্ন হলেও যে সকল ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রকররা এই দু'টি জায়গায় গিয়েছে, তাদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসু নয়ন প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তুকে তাদের রং ও তুলির আঁচড়ে ছবির ফ্রেমে বাঁধার জন্য নির্বাচন করেছেন। তবে এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যতিক্রমধর্মী বেশ কিছু চিত্রসম্ভার আমরা ঢাকা ও কলকাতার চিত্রকলাতে আমরা খুঁজে পাই।

তথ্য নির্দেশ:

১. শামীম আমিনুর রহমান, *শিল্পীর চোখে ঢাকা (১৭৮৯-১৯৪৭)*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১০
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
৩. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৬
৪. শাওন আকন্দ, *জলরঙে ঢাকা*, নূপ অনুপ (সম্পা.), *কালনেত্র*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৮
৫. প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা: অমল গুপ্ত অয়ন, ১৯৭৮, পৃ. ১০
৬. M.Archer, British painters of the Indian scene, Hiren Chakerbarti(ed.) *European Artists and India, 1700-1900*, Calcutta, 1987, p. 1

## পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বিদেশে কোম্পানি আমলের চিত্রকলার সংরক্ষণ স্থানের বিবরণ

## পঞ্চম অধ্যায়

### বাংলাদেশ ও বিদেশে কোম্পানি আমলের চিত্রকলার সংরক্ষণ স্থানের বিবরণ

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ১৬১০ সালে মুঘল রাজধানীর মর্যাদা লাভ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে 'ঢাকা' বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা স্থায়ীভাবে লাভ করে। জনপদ হিসেবে ঢাকার বয়স চারশত বছরের বেশি। আর এই বিশাল সময়ের পরিক্রমায় ঢাকার ইতিহাসে ঘটেছে নানা উত্থান-পতন এবং রয়েছে বৈচিত্র্যময় নানা ইতিহাস। প্রায় দু'শত বছর পূর্বে ঢাকায় যখন কোম্পানি শাসন বিরাজমান ছিল। তখন কয়েকজন দেশিয় চিত্রশিল্পী এবং ঢাকায় আগত ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের রং ও তুলিতে চিত্রিত হয়েছে ঢাকার স্থানীয় মানুষ, প্রকৃতি, গ্রাম, ধ্বংসপ্রায় ইমারত, মন্দির, মসজিদ, ধর্মীয় উৎসব, পালাপার্বন ইত্যাদির এক বাস্তব দৃশ্য। এ সকল চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা ধারণা লাভ করতে করি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢাকার পরিবেশ, জনজীবন, বাদ্য ও পরিচ্ছদ, জীবিকা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে।

ঢাকায় দেশিয় চিত্রশিল্পী ও ইংরেজ-ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের হাতে অঙ্কিত চিত্রগুলো কোম্পানি চিত্রকলার আওতায় পড়ে। ঔপনিবেশিক তথা কোম্পানি আমলে বাংলার মূলকেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সকল ধরনের প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। তবে এক্ষেত্রে ইতিহাস খ্যাত পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকার গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যদিও ঔপনিবেশিক/কোম্পানি শাসনের প্রভাবে ঢাকা তথা বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হয়। তথাপি এ অঞ্চলে বিস্তার ঘটে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির। তাই উপর্যুক্ত সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে ঢাকার চিত্রকলায়। যা 'কোম্পানি চিত্রকলা'র আওতায় পড়ে।

মূলত মুঘল ও পাশ্চাত্যরীতির মিশ্রণে সৃষ্টি হলো এক নতুন শৈলীর যা কোম্পানি শৈলী/কোম্পানি স্কুল/কোম্পানি চিত্রকলা বলে পরিচিত লাভ করে। ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সৃষ্ট ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ইংরেজ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের স্বতন্ত্র চিত্ররীতি।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের আগমন এবং প্রশাসন যত্নে অনুপ্রবেশ ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের ভাগ্যান্বেষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ইংরেজ ও ইউরোপীয় পেশাদার

এবং শৌখিন চিত্রশিল্পীদের জন্য নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। কোম্পানি আমলে এসকল শিল্পীরা বিভবান হওয়ার আশায় ভারতে আগমন করেন। তবে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এ সময়কালে প্রায় ষাট জনেরও অধিক বিদেশি চিত্রকর এদেশে এসেছিলেন।

ভারতে আগত এ সকল বিদেশি চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই ঢাকায় আসেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য হতে ঢাকায় আসা ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের সন্মুখে একটি ধারণা লাভ করা যায়। ধারণা মতে, ঢাকায় যেসকল চিত্রশিল্পীরা আসেন তারা হলেন চার্লস ড'য়লি, জর্জ চিনারী, ফ্রানসেস্কো রেনাস্তি, রবার্ট হোম, আর্থার লয়েড ক্রে, চার্লস পোর্ট, জোসেফ স্কট ফিলিপস, হেনরি ব্রিজিজ মোলসওয়ার্থ, ফ্রেডেরিক আলেকজেন্ডার ডি ফেবেক প্রমুখ।

ঢাকা বিষয়ক চিত্র অঙ্কনে যে কয়েকজন দেশি শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে শিল্পী আলম মুসাব্বির ও দু'একজন অনামা শিল্পী।

ঢাকায় দেশীয় চিত্রশিল্পী ও ইংরেজ-ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের হাতে অঙ্কিত চিত্রগুলো বিভিন্ন সংগ্রহশালায়, ব্যক্তিগত সংগ্রহ, গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। যেমন: বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি অফিস, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ইন্দার পাসরিচা পাইন আর্টস, যুক্তরাজ্য, রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন, ইয়েল সেন্টার পর ব্রিটিশ আর্ট, যুক্তরাষ্ট্র, হার্ভার্ড আর্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থানে। যে সকল গ্রন্থে ঢাকা বিষয়ক চিত্রগুলো রয়েছে যেমন, *অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা*, *লিভস ফ্রম আ ডায়েরী অব লোয়ার বেঙ্গল*, মুনতাসির মামুনের ঢাকা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ, লেখক শামীম আমিনুর রহমানের 'শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭' প্রভৃতি গ্রন্থে। এছাড়া কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এবং ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। এ সকল চিত্রগুলোর কিছু সরাসরি সংগৃহীত হয়েছে এই গবেষণা কর্মের জন্য আবার কিছুর জন্য বিভিন্ন বই উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাইবিলিওথেকের জাদুঘর ও গ্যালারিতে সংরক্ষিত চিত্রের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে।

যদিও আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে আলোচিত ও উল্লেখিত চিত্র ও ড্রয়িং-এর উৎস জানা গেছে। তথাপি বেশিরভাগই আকর চিত্রগুলো আমার পক্ষে সেই সব স্থানে যেয়ে সম্মুখ দেখা সম্ভব হয়নি। যেমন ইংল্যান্ড, বিদেশের বিভিন্ন জাদুঘর ও মিউজিয়ামে রক্ষিত ছবিগুলো সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাদেশের ঢাকার যে সমস্ত জাদুঘর ও

গ্যালারিতে উক্ত ছবিগুলো রয়েছে তা আমার পক্ষে সম্মুখে দেখা সুযোগ হয়েছে এবং সেগুলো আমি গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করে তার বর্ণনা আমার গবেষণাকর্মে উপস্থাপন করতে পেরেছি। তবে উপরে উল্লেখিত বিদেশে সংরক্ষিত যে চিত্রগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তা আমি ইন্টারনেটে দেখেছি যেগুলো আকর চিত্রের প্রতিরূপ। সুতরাং উক্ত চিত্ররাজি আমার দৃষ্টির এড়িয়ে যায়নি। তা আমি গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে চিত্রগুলোর বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার



## ষষ্ঠ অধ্যায়

### উপসংহার

কোম্পানি আমলে ঢাকার চিত্রকলা বিষয়টি এই গবেষণা কর্মের আলোচ্য বিষয়। যা এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আলোচনায় যে বিষয়গুলো এসেছে তা হল: ঢাকা, ঢাকার ইতিহাস, কোম্পানি আমল, কোম্পানি আমলে চিত্রকলার বিকাশ, কোম্পানি আমলে ঢাকায় আগত দেশি ও বিদেশি চিত্রকর ও তাদের আঁকা চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু এবং কোম্পানি আমলে অঙ্কিত ঢাকা ও কলকাতার চিত্রকর্মের মধ্যে একটি স্বল্প পরিসরের তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি।

ঢাকা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। মুঘল আমলে সর্বপ্রথম ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক এটি রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে একবার, অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালে ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ অবধি এই মর্যাদা নিয়ে টিকে আছে। রাজধানী হিসেবে ঢাকার আছে একটি সুখ-দুঃখময় ও উত্থান-পতনের ইতিহাস। আর এই শহরের গৌরব ও উত্থান-পতনগুলো কোম্পানি আমলে ইংরেজ-ইউরোপীয় ও দেশি চিত্রকররা তাদের রং ও তুলিতে চিত্রিত করে তুলেছেন। আর এই চিত্রগুলোর উপাদান ছিল কোম্পানি আমলে এই শহরের মানুষ, প্রকৃতি, গ্রাম, ধ্বংসপ্রায় ইমারত, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন ঘটে বণিকের বেশে আর সময়ের পরিক্রমায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে ইংরেজে বণিকদের এই মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। এই সময়ে বহু জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত, পর্যটক, চিত্রকর, স্থাপত্যশিল্পী এই উপমহাদেশে আগমন করেন অনুসন্ধিসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আর তাদের পথ ধরে অষ্টাদশ শতাব্দী হতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিদেশি চিত্রকর এই উপমহাদেশে আসেন। এ সকল চিত্রকর ও সাথে ইংরেজদের বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা দেশিয় চিত্রকররা তাদের রং ও তুলিতে সে সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবেশ-প্রকৃতি, জনজীবন, উৎসব, পালাপার্বণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি আমাদের কাছে বাস্তব করে রেখে গেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে আগত বিদেশি চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন পূর্ব বাংলার ঢাকা অঞ্চলে যা গবেষণা কর্মটির ভূমিকা পূর্বে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকায় আগত

এসকল চিত্রকরদের মুঘল রাজধানীর ভগ্নপ্রায় ইমারত, মন্দির, মসজিদ, এ অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ, প্রকৃতি, গ্রাম প্রভৃতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে যা তারা তাঁদের তুলির আঁচড়ে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন। আগত বিদেশি চিত্রকরদের পাশাপাশি দু'একজন দেশি চিত্রকরও ঢাকা বিষয়ে চিত্র এঁকেছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিদেশি চিত্রকরদের আগমনের পেছনে যে প্রেক্ষাপট কাজ করে তা ছিল এরূপ, রাজনৈতিক দিক থেকে পলাশীতে ইংরেজদের হাতে সিরাজউদ্দৌল্লাহর পরাজয়ের মধ্যমে মুর্শিদাবাদে তখন নবাবি শাসনের ধারা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার মুর্শিদাবাদ শৈলীর চিত্ররীতি বিলুপ্ত দিকে ধাবিত হয়। ঠিক তখনি হিন্দু উঠতি পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দরবারি শিল্পীরা হিন্দু-ধর্মের নানা বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রাঙ্কন চালিয়ে যেতে থাকে। মূলত এ সময়ে মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতি স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দরবার বহির্ভূত স্থানীয় চিত্রকলার সহযোগিতাপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও জড়ানো পটচিত্র এবং অন্যটি ইংরেজ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের স্বতন্ত্র চিত্ররীতি।<sup>২</sup> মূলত মুঘল ও পশ্চাত্য রীতির মিশ্রণে সৃষ্টি হলো এক নতুন শৈলীর যা 'কোম্পানি শৈলী' বা 'কোম্পানি স্কুল' বা চিত্রকলা নামে পরিচিতি লাভ করে।<sup>৩</sup>

এই কোম্পানি শৈলীর আন্ততায় বহু দেশি ও বিদেশি ইংরেজ ও ইউরোপীয় চিত্রকর'রা প্রায় দু'শত বছর বা তারো বেশি সময় ধরে এই চিত্রশৈলীর চর্চা করেন যা ফটোগ্রাফি প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত পঞ্চাশের দশকের পর ফটোগ্রাফির প্রচলন শুরু হলে কোম্পানি শৈলীর অবনতি ঘটতে থাকে। মিলড্রেড আর্চারের মতে, উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কোম্পানি শৈলী প্রবাহমান ছিল।<sup>৪</sup>

কোম্পানি শৈলীর আন্ততায় গড়ে ওঠা ঢাকার চিত্রকলা বা চিত্রশিল্পের নিজস্ব কোন রীতি কিংবা বিশুদ্ধ ব্রিটিশ বৈশিষ্ট্য কোনটিই ছিল না। বরং এতে মুঘল প্রভাবই সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত উপমহাদেশের সর্ব-পূর্বে অবস্থিত ছিল বলেই মূলত এ অঞ্চলের চিত্রশিল্প তেমন সাফল্য অর্জন করেনি। অল্প কিছু চিত্রকর্মে, যেমন ঈদ ও মহররমের মিছিলের চিত্রশৈলীতে অবক্ষয়ের ছাপ লক্ষ করা যায়। কারণ পরবর্তী সময়ে অল্পকিছু চিত্রশিল্পই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এবং এর পূর্ববর্তীকালের চিত্রকর্ম আবহাওয়াজনিত অথবা যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জানা যায় যে, বেশকিছু পণ্ডিত ভারতীয় শিল্পীদের ওপর ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের

প্রভাব এবং কোম্পানি স্কুলের উদ্ভব ও বিকাশের উপর গবেষণা কর্ম করেছেন। “তাদের গবেষণা হতেই এটাই সুস্পষ্ট যে, এটাকে যদিও কোন প্রধান ধারা বা স্কুল বলে আখ্যায়িত করা চলে না, তথাপি দু’শতাব্দীর চিত্রশিল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনে এর একটা গুরুত্ব আছে।”<sup>৫</sup>

ঢাকার ওপর যেসকল চিত্রকররা চিত্র এঁকেছেন বেশির ভাগ চিত্রকর্মগুলো এনগ্রেভিং করে আঁকা হয়েছে। এনগ্রেভিং সাধারণত অ্যাপল ট্রি বা পাইন গাছের কাঠ দিয়ে করা হয়ে থাকে। এনগ্রেভিং আবার জিংক প্লেট, কপার প্লেটেড করা হয়ে থাকে। এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে চিত্রগুলোতে নিপুণতা এসেছে। কারণ খাড়া খাড়া আঁশ থেকে টুলস দিয়ে খোদাই করে ড্রইং করা হয়েছে, টেকচার দেয়া হয়েছে এবং আলোর মার্জিত ব্যবহারে চিত্র দেখতে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি করে দেয়।<sup>৬</sup>

কোম্পানি আমলে কোম্পানি শৈলীতে গড়ে ওঠা ঢাকার চিত্রকলা বিষয়টি এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে গবেষণা করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে কোম্পানি আমল সময়টি বর্তমান সময় থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই শত বছর পূর্বে হওয়ায় সে সময়ের তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার অপ্রতুলতার পাশাপাশি সঠিক তথ্যটি খুঁজে বের করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণের অভাব এই গবেষণা কর্মের সীমাবদ্ধতার প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া যে সকল তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গেছে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিষয় নিয়েও সমস্যা বিদ্যমান থাকায় কারণ বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোর বিভিন্নতা রয়েছে।

যদিও এসকল বাধা-বিপত্তি, সীমাবদ্ধতা গবেষণা কর্মটিকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তথাপি আলোচিত গবেষণাকর্মটি ব্যাপক পরিসরে ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও নানা নির্ভরযোগ্য উপাদানের সংমিশ্রণে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি চিত্রকলাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল দু’টি ধারা: একটি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা দেশীয় শিল্পীরা, অন্যটি ভারতে আগত ইংরেজ ও ইউরোপীয় পেশাদার এবং শৌখিন শিল্পীরা। স্থানীয় শিল্পীরা হাতে তৈরী কাগজের উপরে গোয়াশ পদ্ধতিতে মিনিয়েচার অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু কোম্পানি আমলে আমরা লক্ষ করি ইংরেজ শাসকদের নিয়োগপ্রাপ্ত শিল্পীদের হাতে তৈরি কাগজের উপরে স্বচ্ছ জল রং দিয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত বেশ কিছু চিত্রাঙ্কন করেছিল

সীতারাম, ভবানী দাসসহ প্রমুখ শিল্পীরা। কোম্পানি আমলে নওয়াব নুসরাত জং-এর সময়ে ঈদ ও মহররমের চিত্ররাজিতে শিল্পী আলম মুসাব্বির হাতে তৈরি কাগজের উপরে স্বচ্ছ জল রঙে মুঘল ও ইউরোপীয় শৈলীর যুগৎপাত ব্যবহার করেন। কোম্পানি আমলে ভারতে সর্বত্র এবং ঢাকায় ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় একাডেমিক ধারায় ইংল্যান্ড হতে আমদানী করা কাগজে স্বচ্ছ জল রঙে ছবি আঁকেন। এছাড়াও তারা স্কেচ ও তেল রং ব্যবহার করেন। ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রে আমরা আলো-ছায়ার ব্যবহার লক্ষ্য করি তা যে মাধ্যমেই হোক না কেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে আলো-ছায়ার মাধ্যমে শিল্পীরা চিত্রে বাস্তবতা আনেন। যা আমরা কোম্পানি আমলে আগত শিল্পীদের চিত্রে লক্ষ্য করি। এ সকল শিল্পীরা হলেন চার্লস ড'য়লি, জর্জ চিনারী, রবার্ট হোম, আর্থার লয়েড ক্রে প্রমুখ। এ সকল শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রকৃতি, ঘরবাড়ি, জনজীবন, খাদ্য ও পরিচ্ছদ, জীবিকা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এগুলিতে ধরা রয়েছে... “যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমিত। এছাড়া এঁদের অঙ্কিত চিত্রকলা ভারতীয় উচ্চবিশ্ব ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় বাস্তববাদী শিল্পধারায় আসক্ত করে তোলে, যা ভারতীয় শিল্পের পরবর্তী রূপ পরিগ্রহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।”<sup>৭</sup>

**তথ্য নির্দেশ:**

১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড-৪, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৮০
২. শাওন আকন্দ, 'ঔপনিবেশিক যুগ' (১৭৫৭ -১৯৪৭), সূফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -০২*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৮১.
৩. ফয়েজুল আজিম ও আবুল মুনসুর, কোম্পানি শৈলী ও ভারতে আগত বিদেশী চিত্রকর, লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-০৮*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১৪
৪. R.P Gupta, 'Art in old Calcutta', in Sukanta Chaudhary (ed.), *Calcutta the living City, Vol-1*(New Delhi, 1990), p.138
৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড-০৩, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩৫৮
৬. সঞ্জয় দে রিপন, পাশ্চাত্যের চিত্রকর্মে ঢাকা, এ.এ. হাম্মান পিরোজ (সম্পা.), *ঢাকা ৪০০ বছর*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ২৮৫.
৭. প্রদ্যোৎ গুহ, কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর, কলকাতা: অমল গুপ্ত অয়ন, ১৯৭৮, পৃ. ১-৯৫

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১

পরিভাষা: চিত্রকলা ও স্থাপত্য

**মিহরাব (Mihrab)**- মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে কিবলা নির্দেশক স্থাপত্য প্রতীক ।

**পরিপ্রেক্ষিত(Perspective)** - কোন চিত্রের পটপ্রেক্ষিতে যে উপাদানের মাধ্যমে গভীরতার সৃষ্টি করা হয় তাকে পারসপেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত বলে । অন্য কথায় দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠদেশে ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতির ব্যবহারকে পরিপ্রেক্ষিত বলে ।

**ত্রি-মাত্রিক (Three - Dimension)**- দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠদেশে পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা গভীরতা সৃষ্টির যে পদ্ধতি তাই ত্রি-মাত্রিকতা । স্থাপত্যকলায় সাধারণত কাঠ, ধাতব পদার্থ, কাচ ইত্যাদির মাধ্যমে ত্রি-মাত্রিকতা সৃষ্টি করা হয় ।

**মিনিয়চার (Miniature)**- রং এবং তুলির সাহায্যে কাগজ ,কাঠ, ধাতব পদার্থ, কাচ ইত্যাদিতে চিত্র অঙ্কন করাকে মিনিয়চার পেন্টিং বলে ।

**মিনার (Miner)**- মসজিদেও বাইরে ও মসজিদ সংলগ্ন বুরুজ সাদৃশ্য স্থাপনা যা থেকে সাধারণত নামাজের আযান করা হয় ।

**বাস্তবধর্মী চিত্র (Realistic Art)**- শিল্পী যখন কোন প্রকার প্রতীকধর্মী প্রথার বহির্ভূত কোন বিষয়বস্তু ছবছ চিত্রায়ন করেন, তখন সেটাকে বাস্তবধর্মী চিত্র বলে ।

**খিলান (Arch)**- একটি উন্মুক্ত স্থানের সংযোগ সাধনের লক্ষে ইট, পাথর কিংবা অন্য কোন উপাদান ব্যবহার করে গোজাঁকুতি ও মৌলিক জোড় স্থাপনের দ্বারা এক অর্ধ -গোলকৃতি স্থাপত্য কৌশলই খিলান ।

**ইওয়ান(Iwan)**- খিলান আকারের বিশাল প্রবেশপথ, বিশেষ করে প্রাসাদ স্থাপত্যে দেখা যায় ।

**বন্ধ খিলান (Blind Arch)** - খিলান আকৃতি দেওয়া স্থাপত্য নকশা বিশেষ ।

**কাটরা (Katra)**- সাধারণত বোঝায় মাঝখানেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গন যার চারদিকে সারিবদ্ধ কক্ষের সমাবেশ ।

**ইমামবাড়া( Imambara)** - হযরত ইমাম হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত ইমারত । ৩১ হিজরির ১০ মহররমের (৬৮০ সালে ১০ অক্টোবর) তারিখে ইরাকের কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনের শহীদত্ব স্মরণ করার জন্য ইমারতটি নির্মাণ করা হয় ।

**মসলিন(Muslin)**- মসলিন শব্দ মসূল নাম থেকে উদ্ভূত । মিহি স্বচ্ছ সুতিবস্ত্র মসলিন ।

**ঘরকাচিমহল (Gharkachi -Mahal)** - খড়, বাশ নলখাগড়া প্রভৃতি দিয়ে নির্মাণ করা ঘর-বাড়ি ।

**ওরিয়াল উনডো (Oriental Window)**- জুলন্ত জানালা নকশার স্থাপত্য বিশেষ ।

**বাংলা ঘর (Bangla Ghar)**- বাড়িঘর তৈরির এমন এক রীতি যে ঘরের দেয়াল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাশের বেড়া দিয়েই তৈরি, যাতে বায়ু চলাচলে সুবিধা হয় । পাশাপাশি খড়ের চাল ঢালু হওয়াতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নিচে পড়ে যেত ।

নায়েব- নাজিম (Nawab-a-Nazim)- উপ- নবাবরা

বরাহ (Pig)- শূকর

দেউড়ি(Gate) - প্রবেশপথ

ওয়াটার ওয়াকার্স (Water wakers)- ঢাকায় প্রথম পরিশুত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা

তেল রং (Oil Color)- আকর রং-এর সাথে তৈল সংমিশ্রণে করে তেল রং তৈরি করা হয়। এই রং - এর সাহায্যে ক্যানভাসের উপর চিত্র অংকন করা হয়

জল রং (water color)- আকর রং-এর সাথে জলের সংমিশ্রণে করে জল রং তৈরি করা হয়। এই রং সাহায্যে সাধারণত কাগজের উপর চিত্র অংকন করা হয়

মার্শন ( Marlon)- পদ্ম পাতার আকারে ছাদ প্রাচীরের স্থাপত্য



পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২



চিত্র : প্যানোরমা অব ঢাকা, উৎস : শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭।



চিত্র : আয়েশি ভঙ্গিতে মুসলিম নারী (ঢাকা), চিত্রকর : ফ্রান্সিসকো রেনাল্ডি, উৎস : শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭।



চিত্র : জে জি এন পগোজ, চিত্রকর : চার্লস পোট উৎস : শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭।



চিত্র : ঢাকার রেস গ্রুপ, শিল্পী অজ্ঞাত, উৎস : শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭।



চিত্র : ঢাকার নায়েরব নাজিম নুসরত জংয়ের প্রতিকৃতি, শিল্পী অজ্ঞাত, সৌঃ বাংলাদেশ জাতীয়,

উৎস : শিল্পীর চোখে ঢাকা ১৭৮৯-১৯৪৭।

## গ্রন্থপঞ্জি:

- আউয়াল, ইফতিখারুল-উল (সম্পা.), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, ঢাকা :বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩
- আহমেদ, শরীফউদ্দিন, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, তয় সংস্করণ, ঢাকা :একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ২০০৬
- আহমদ, এমাজউদ্দিন ও হারুন-অর-রশীদ (সম্পা.), *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি , বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
- আহমেদ শরীফউদ্দিন (সম্পা.) *ঢাকা কোষ*, ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২,
- আহমদ, মনোয়ার, *ঢাকার পুরোনো কথা*, ঢাকা: মাওলা বাহার্স, ২০০৮
- আজিম ,ফয়েজুল, *বাংলাদেশের শিল্পকলার শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা: ২০০০
- আমিনুর রহমান, শামীম, *শিল্পীর চোখে ঢাকা (১৭৮৯-১৯৪৭)*, ঢাকা: প্রথম প্রকাশন, ২০১২
- ইসলাম, রফিকুল, *যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল*, ঢাকা: প্রকাশক-মির্জা মোহাম্মদ ইউনুছ, বর্ণতরু, ২০১২
- ইসলাম, রফিকুল, *ঢাকার কথা ১৬৯০-১৯১০*, ঢাকা:, ১৯৮২
- ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৭-১৮৫৭*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১
- ইসলাম ,সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস-তয় খন্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩ ।
- ....., *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)-তয় খন্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৩
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড -০১,০৩,০৪,০৬,০৯,১০ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩
- করিম, আবদুল, *ঢাকাই মসজিদ*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫
- ক্রে , আর্থার লয়েড ,*ঢাকা : ক্রে,র ডায়েরী ১৮৬৬-১৮৭৬*, রূপান্তর: ফওজুল করিম, ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর
- খালেকুজ্জামান. মো:, *বিজ্ঞান জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০২
- খান, কে.এম.রাইচউদ্দিন ,*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, (নবম সংস্করণ) : জুলাই, ১৯৯৮
- গুহ প্রদ্যোত্ত, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা:অমল গুপ্ত অয়ন, ১৯৭৮
- চৌধুরী, আব্দুল মমিন (সম্পাদিত), *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬
- টেলর, জেমস, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, (অনুবাদক আসাদুজ্জামান মোহাম্মদ) ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮
- নাথান, মীর্জা, *বাহারিস্তানি ই গায়েবী-১ম খন্ড* (খালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
- পাছ শ্রী, *কলকাতা :কোলকাতা*, ১৯৯৯

- ব্রাডলী,বার্ট, এফ বি, *প্রাচ্যের রহস্যনগরী*, (অনুবাদ: সিদ্দিকী, রহিম উদ্দিন), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
- ভট্টাচার্য অশোক, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা , ১৯৯৪
- রহমান, মুহাম্মদ মোখলেছুর, *স্থাপত্য পরিভাষা*, ঢাকা :বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
- রহমান, হাকীম হাবিবুর, *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে*(অনুবাদক : করিম, মোহাম্মদ রেজাউল), ঢাকা: প্যাপিরাস, ২০০৫
- রহমান, মোস্তাফিজুর (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -৩* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
- রায়, যতীন্দ্রমোহন,*ঢাকার ইতিহাস*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৩
- মিঞা, আব্দুল হাকিম, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নবাব-ঐতিহাসিক রূপরেখা*, ঢাকা : জ্যোতিপ্রকাশ, ২০০৩
- মামুন মুনতাসির, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩
- ....., *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে*, ঢাকা ,পার্ল পাবলিকেশন, ১৯৯৬
- ....., *পুরানো ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
- ....., *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১ম খন্ড*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১০
- ....., *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরীর-২য় খন্ড*, ঢ: অনন্যা, ২০০৯
- মুখোপাধ্যায়, সুখময় । *বাংলার ইতিহাস ১২০৪-১৫৭৬*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০০
- মুহাম্মদ,আব্দুর রহিম প্রমুখ, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিহান,১৯৮১
- মুজুমদার, রমেশচন্দ্র ,*বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড (৫ম সংস্করণ )*, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭
- ....., *বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড (৫ম সংস্করণ )*, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮
- ....., *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড (৩য় সংস্করণ )*, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭
- স্যার চার্লস ড.য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, ভাষান্তর –শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম,: হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), ঢাকা:একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪,
- সেলিম, লালা রুখ (সম্পা.), *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
- হক, সৈয়দ লুৎফুল ,*হাজার বছরে ঢাকার চিত্রকলা ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১২
- হায়াৎ অনুপম, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক এসজ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১
- হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা*,(তৃতীয় সংস্করণ),ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লি, ১৯৯৫

হোসেন, এ বি এম (সম্পা.), *ছাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -১*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

### English Books

Nathan Mirza , *Baharistan-I-Ghayabi*, Vol-1, Translated by

M.I Borah (1<sup>st</sup> ed.) Guahati: Narayani, Hanitui Historical Institute, 1936

M.Archer, *British painters of the Indian scene*, Hiren Chakerbarti(ed.) European Artists and India, 1700-1900 , Calcutta, 1987

Ahmed,Sharif Uddin (ed.), *Dhaka Past Present Future (Second Edition.)* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009

..... , *Dacca...A Study in Urban History and Development 1840-1885*, London:Curzon press, 1986

..... , *Dhaka... A Study in Urban History and Development, 1840-1921*, second Revised (Ed.) Dhaka: Academic Press and Publication, 2003

Ahmed, Nazimuddin, *Mughal Dacca and the Lalbagh Fort*, Dacca: 1982

Haider, Azimusshan, *Dacca:History and Romance in Place Names*, Dacca, Pub: By the Author, 1967

Chakervarti, P.B, *The study of Antiquities in Dacca*, Dhaka, 1920

Gupta, R.P, 'ART in Old Calcutta', in Sukanta Chaudhary (ed.), *Calcutta the Living City, Vol-1*, New Delhi: 1990

Dani, Ahmed Hasan, *A Record of its Changinf Fortunes*, Dhaka: Mrs. Sufia's Dani, 1962

Hossain, Syed, *Echoes from Old Dacca* (reprint), Dhaka: Hakkani Publishers, 2001

Islam, Sirajul, *History of Bengal: Colonial administration (Bangla)*, Dhaka: Chayanika, 2002

Islam, Sirajul, *History of Bangladesh (1704-1971)*, 3 Vols, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998

Karim, K.M, Naib Nazmis of Dacca, *Abdul Karim Sahitya Bisahrad, Commemoration Volume*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1972

Karim Abdul, *Dacca the Mughal Capital*, Dacca:1964.

Taifoor, S.M., *Glimpses of Old Dhaka (2<sup>nd</sup> ed.)* Dhaka: Pioneer Printing Press Ltd, 1956  
Tailor, James, *Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta : N.P, 1840  
Taylor James, *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca*,  
London: 1851

### গেজেটীয়ার

ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার, (বৃহত্তর ঢাকা), উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা: ১৯৯৩

### অভিসন্দর্ভ

ফয়েজ, আবুল, ঢাকার চকবাজার এলাকার স্থাপত্যকীর্তি, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,  
1992

### সাময়িকী ও সংবাদপত্র

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, 'ঢাকা : একটি নগর উঠার কাহিনী সুন্দরম, ৩(৪), ঢাকা: ১৯৮৯

চৌধুরী, আফসান। 'প্রাচীন ঢাকা,। *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা*, ঢাকা : ১৯৯৯

বারী, মো: আব্দুল। 'ঢাকায় প্রাচীন কীর্তি, মাসিক মোহাম্মদী, ৩৬(৩)। ঢাকা : ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

রহিম, আব্দুর, " কোম্পানি আমলে বাংলার মুসলমান জমিদারির ইতিহাস,, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৭ম  
বর্ষ -২য়-৩য় সংখ্যা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

হাসান, পারভীন। "স্থাপত্য ও চিত্রকলা, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) গ্রন্থে*  
*সংকলিত, তয় খন্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০

### Thesis Unpublished

Azam, Md. Rafiq. 'Old Dhaka Cultural Centre' (MRUP Thesis)

Bhatasali, N.K. 'English Factory at Dacca' in Bengal Past and Present, Vol-33, india,  
1927

Davidson, C.J.C 'Dacca in 1840'. Bengal Past and Present, Vol-42, Dhaka: 1931

Khan, M.Siddique. 'Glimpses of Jahangir Nagar, Pakistan Quarterly, 892), 1958



## **Encyclopaedia**

Banglapeadia, Dhaka: Bangladesh Asiatic society, 2003

## **Articles: Journal:**

Ali, Syed Murtaza-“Dacca Muslin”, Dacca: JASP, Vol-Xiii, No-2, 1968

Alam .A.K.M Shamsul. Lalbagh Fort: The Splendor of mughal Dhaka. Jatree 6(3), Dhaka: 1990

Brown, Rebecca M., “Sir Charles D’oyle in Dhaka: The Colonial Picturesque” Journal of Bangal Art, Enamul Haque(ed.), Vol-2, Dhaka:ICSBA, 1997

Banerji.S.C ‘ Naib Nazims of Dacca During the Company’s Administration’ 1778-1843, in Indian Historical Record Commission, Proceedings, Vol- XVI ( 1939),1940.

Ghafur.M.A “Archacological Research in Bangladesh” DACCA: Journal of Bangladesh Asiatic Society, Vol-17, No-1, 1972

Hasan, Syed Aulad. ‘Old Dacca: in Dacca Review’. Calcutta: 1909

Imam, Abu, Origin of the Name Dhaka (Dacca): in A Note. Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-3, Dacca: A.S.P.1958.

Khan, M.Siddiq. ‘Life in Old Dacca’ (Sketch of Social Life in Dhaka during the 19<sup>th</sup> Century). In Pakistan Quarterly. Vol.no.9

Majlis, Najma Khan, ‘Dhaka in Early Nineteenth century Painting’ In: Dhaka Past Present Future (2<sup>nd</sup> ed, ed by Ahmed), Sharif Uddin, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009

Rankin, J.T. ‘Dacca Dairies’ in Journal of the Asiatic Society Bengal of Bengal. Vol.No-16, Calcutta, 1920

Rankin, J.T ‘The Study of Antiquities in Dacca: Selection From the Dacca Review’, Vol-9, Bangladesh.

Stapleton, H.E ‘The Antiquity of Dacca’. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol-6, 1910.

**Survey**

Islam, Sirajul (ed.), Bangladesh District Records: Dacca District, Dhaka: University of Dhaka, 2000

Rashid, Abdur, District Census Report Dacca, Dacca: Census Commission, 1964

**Gazetteer**

J.E, Webster- Eastern Bangal District Gazetteers, Tippera, Alahabad, 1910

**Souvenir**

Haider, Azimusshan, 'A City and its Civic Body- a Souvenir to Mark the Centenary of Dacca Municipality, Dacca, 1966